দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা



বিজেপির দরকার
একটি ছাঁকনি
— পৃঃ ২৬

মুক্তির দিশারি
ভারতকেশরী
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
—পৃঃ ৪৩



৭১ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ১৭ জুন ২০১৯।। ১ আষাঢ় - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



কতটা বেনোজল আটকাতে পারবে বিজেপি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৭ জুন - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বাম আমলের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হাল আমলে জেগেছে ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদিকে ভালো থাকতে দিন প্লিজ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

নরেন্দ্র মোদী হিন্দুর এক মানবিক গুণ আবিষ্কার করেছেন ▯ রাহুল শিবশঙ্কর ▯ ৮

লোকসভার নির্বাচন ও জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে ▯ বিনয়ভূষণ দাস ▯ ১১

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ক্ষমতালোভী বিরোধীদের নিম্নরুচির প্রচার ▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ১৩

মোদী সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ও আমার প্রত্যাশা ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১৫

মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'ভূত' ভেবেই জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে ভয় পাচ্ছেন ▯ সৃজিত রায় ▯ ১৭

বেনোজল পানের অযোগ্য, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৩

সংখ্যাধিক্যের গণতন্ত্রে বেনোজলের প্রাধান্য বিপজ্জনক ▯ সুজিত রায় ▯ ২৪

বিজেপির দরকার একটি ছাঁকনি ▯ আদিনাথ ব্রহ্ম ▯ ২৬

'ও পিসি তুই চলে যা, জয় বাংলায় চলে যা, হেথায় তোকে...' ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৮

যোগ এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এক বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় ▯ ডা. আর এন দাস ▯ ৩১

গল্প : নতুন বউ ▯ সিদ্ধার্থ সিংহ ▯ ৩৫

মুক্তির দিশারি ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ▯ ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮**

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯

প্রকাশিত হবে
২৪ জুন
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৪ জুন
২০১৯

রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ

সালটা ২০১১। ক্ষমতায় আসার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্লোগান ছিল, 'বদলা নয়, বদল চাই'। এর ঠিক আট বছর পর ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর মমতা স্পষ্টতই বদলার রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। তাঁর বদলা বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপির নেতা-কর্মীরা খুন হচ্ছেন রাজ্যজুড়ে। মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। এরই মধ্যে একটা প্রশ্ন হাওয়ায় ভাসছে— আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতির কারণে কেন্দ্র কি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চলেছে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এইসব বিষয়ের প্রতি আলোকপাত। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায়, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

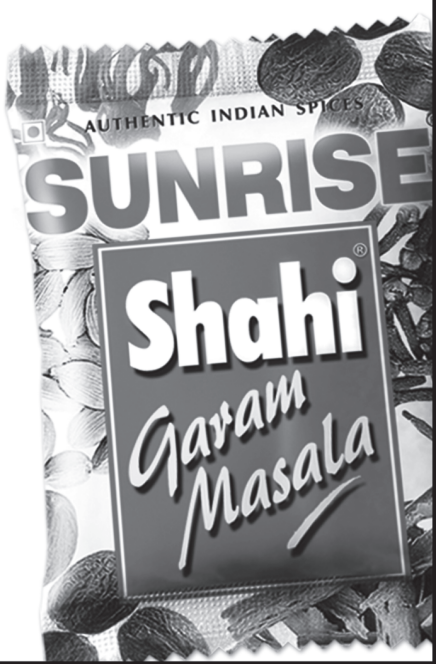
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বৃদ্ধি যেন অনিয়ন্ত্রিত না হয়

নির্বাচন পর্ব মিটিতে না মিটিতেই পশ্চিমবঙ্গে দলবদলের হিড়িক পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে হইতেছে, ওঁত পাতিয়া অনেকেই বসিয়াছিলেন। সময় এবং সুযোগ মতো তাহারা প্রত্যেকেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। দলবদলের এই উন্মাদনাকে নিছকই আকস্মিক বলিলেও ভুল হইবে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন এবং দলের অধোগতিতে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত ছিলেন। উপযুক্ত বিকল্পের সন্ধানে এই ব্যক্তিরা প্রহর গুনিতেছিলেন। এই বারের লোকসভা নির্বাচন তাহাদের সম্মুখে বিজেপি নামক সেই বিকল্পটিকে উপস্থিত করিয়াছে। ফলত তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া বিজেপির শিবিরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন। অবশ্য শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ নেতা-নেত্রীরাই আসিতেছেন বলিলে ভুল হইবে। সিপিএম এবং কংগ্রেস হইতেও বহু কর্মী এবং নেতা বিজেপিতে আসিতেছেন। কারণ, ইহারা বুঝিতেছেন, এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিহত একমাত্র বিজেপিই করিতে পারে। বিজেপিই পারিবে তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচারের অবসান করিতে। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বও চাহিতেছেন রাজনৈতিক রণকৌশল হিসাবে শত্রুর ঘর এই উপায়ে ভাঙিয়া দিতে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রও রাবণের বিরুদ্ধে এই রণকৌশলের আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিজেপি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। এই দল কেন্দ্রে এখন নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই রাজ্যেও বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। আশা করা যাইতেছে অদূর ভবিষ্যতে বিজেপিই এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসিবে। এমতাবস্থায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিজেপির নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এই দলে যোগদান করিতে চাহিবেন—ইহাতে অন্যায়ের কিছু নাই। বিজেপির পক্ষেও দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা অনুচিত কাজ হইবে। দলের প্রসার এবং প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই তাহাকে অন্য রাজনৈতিক দল হইতে আগত ব্যক্তিদের জন্য নিজ দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যে কারণেই বিজেপি নেতৃত্ব ফিরাইয়া দিবার বদলে গ্রহণ করিবার নীতি লইয়াছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তো বলিয়াই দিয়াছেন, সমগ্র জুন মাস ধরিয়া রাজ্যে যোগদান মেলা চলিবে।

শত্রুর ঘর ভাঙিয়া দিবার বিজেপির যে এই রণকৌশল—তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নেই। এই রণকৌশলে যে কিছু কিছু সাফল্য আসিতেছে তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। কিন্তু এরই ভিতর বিজেপিকে কিছুটা সতর্কতাও অবলম্বন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বাঁধের মুখ খুলিয়া দিলে স্বচ্ছ জলের সঙ্গে বেনোজলও প্রবেশ করে। ফলে, দিন পরিবর্তনের আভাস পাইতেই আজ যাহারা বিজেপির আশ্রয়ে আসিতে চাহিতেছে, তাহারা সবাই স্বচ্ছ নয়। ইহাদের মধ্যে বেনোজলও আছে। এই বেনোজলেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে এক সময় সিপিএম শিবিরে আশ্রয় লইয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহারাই দল বদলাইয়া তৃণমূল শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমানে ইহারাই আবার বিজেপিতে আসিতে চাহিতেছে। ইতিহাস হইতে শিক্ষা লইয়া বিজেপিকে বুঝিতে হইবে—এই বেনোজলের স্রোত দলের ক্ষতি করিবে। দলের ভাবমূর্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করিবে। বিজেপির মতো দল, যাহারা নিজেদের 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স' বলিয়া প্রচার করে, তাহাদের তো এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকাই উচিত।

কাজেই, রণকৌশল হিসাবে অন্য শিবির ভাঙাইয়া নেতা-কর্মীদের বিজেপিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক। কিন্তু পাশাপাশি, অবারিত প্রবেশাধিকার না দিয়া চালুনির মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তিটিকে বাছিয়া লওয়া হউক। অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি নয়, দলের বৃদ্ধিটাও যেন নিয়ন্ত্রণের ভিতরেই থাকে—সেই বিষয়ে সজাগ হউক বিজেপি।

সুভাষিতম্

আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষণম্।

সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনম্।। (চাণক্য নীতি)

আচার-ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্তির বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার দ্বারা দেশের পরিচয় পাওয়া যায়, আদর-আপ্যায়নের দ্বারা স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় এবং শরীর দেখে তার আহারের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

বাম আমলের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হাল আমলে জেগেছে

২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ কিছু হোর্ডিংয়ে ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যটাকে। উত্তর কলকাতায় চোখে পড়ছিল বড়ো বড়ো হোর্ডিংগুলি। কেন্দ্রে তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। উত্তর কলকাতায় বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। হোর্ডিংয়ের মূল বিষয় বাঙ্গলার সংস্কৃতির সঙ্গে এই আর এস এস- বিজেপিকে মেলানো যায় না। অতএব... বুঝতেই পারছেন, তথ্যাভিজ্ঞমহল সেদিন সেই হোর্ডিং দেখে মুচকি হেসেছিলেন। নেতাজী যাদের কাছে 'তেজোর কুকুর', রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয় কবি', যারা '৬৭-তে নামমাত্র ক্ষমতায় এসেই রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন বন্ধ করে দিয়েছিল গায়ের জোরে, যারা চিরটাকাল বিবেকানন্দকে 'চাকরি না পেয়ে সন্ন্যাসী', কিংবা রামকৃষ্ণদেবকে 'মৃগীরোগী' বলে এসেছে, যাদের সংস্কৃতির ধারক বাহকরা বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মূর্তি ভেঙেছে 'বাঙ্গালি সংস্কৃতি' নিয়ে তাদের প্রচার বিসদৃশ-ই লাগেনি, অশনি সংকেতটাও বাঙ্গালি সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল, যখন উর্দুভাষী মুসলমান এলাকায় গিয়ে সেলিম বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতেন।

কীরকম অশনি সংকেত জানেন? বাঙ্গলাকে, বাঙ্গলার মনীষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করে দেওয়া। বাম আমলে সান্ধ্যকালীন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে অনেকে 'রসুন' সন্ধ্যা বলে অভিহিত করতেন। রসুন মানে রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, নজরুল। রবীন্দ্রনাথকে এরা হিন্দু, নজরুলকে মুসলমান আর সুকান্তকে কমিউনিস্ট বলে দেগে দিতে চেয়েছিল। তিনটেই সত্যি, কিন্তু বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির সংস্কৃতিকে বিভাজনের পন্থা এর মধ্যে দিয়েই দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মমতা ব্যানার্জির 'হিন্দুদের রবীন্দ্রনাথ, মুসলমানদের নজরুল'-বাক্যবন্ধনীর প্রয়োগ স্রেফ বাঙ্গলায় বামপন্থীদের বিভাজনকামী সংস্কৃতির সাফল্যকেই তুলে ধরে। তাই আজ যখন বাম-তাত্ত্বিকেরা 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'র তত্ত্ব আনেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি উসকে দেন, আর এস এসকে নিষিদ্ধ করার প্রাণপণ দাবি তোলেন ও এরাজ্যে বিজেপি- আর এস এসকে 'ডেকে' আনার জন্য তৃণমূলকে অহরহ গালি পাড়েন, তখন বোঝা যায় এদের নীতি— 'আক্রমণই আত্মরক্ষার মূল উপায়।'

হ্যাঁ, আজকের বিলুপ্তপ্রায় রাজনৈতিক প্রজাতি বামেদের আত্মরক্ষার বর্মের প্রয়োজন

বিশ্বামিত্র-র কলম

বৈকি! পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের এক মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'অসভ্য, বর্বর দল'। আরেক মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য : 'দাঙ্গা করতে এলে বিজেপি আর এস এসের মাথা ভেঙে দেব।' পশ্চিমবঙ্গে সেই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বকালে দাঙ্গা- পরিস্থিতির আদৌ উদ্ভব হয়েছিল কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় গুজরাট দাঙ্গার জন্য এই মন্তব্য, তাহলে বলতে হয় গুজরাট তো গোধরার প্রতিক্রিয়া মাত্র। গোধরার নৃশংস হামলাবাজদের মাথা কী গুঁড়োতে চাইবেন তিনি? উত্তর হলো না।

এবার তবে কী বুঝলেন? ওই 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'র প্রকৃত জনকদের চেনা গেল তো? ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পীঠস্থানকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলতেন যিনি, তাঁরই মুখে 'বিজেপি অসভ্য, বর্বর' শব্দগুলি গণতন্ত্রের পক্ষে কী নিদারুণ ভয়াবহতা সৃষ্টি করে, তা বোঝা যায়। আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত সেদিনও ছিল, তবে বামপন্থীদের সংগঠিত শক্তি তাকে সুপ্ত রেখেছিল, মমতার সংগঠন-হীনতা তাকে জাগিয়ে তুলেছে, এই যা! কেন্দ্র বিরোধী স্লোগানেরও জনক সিপিএম। তাদের রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে বাঙ্গালিরা।

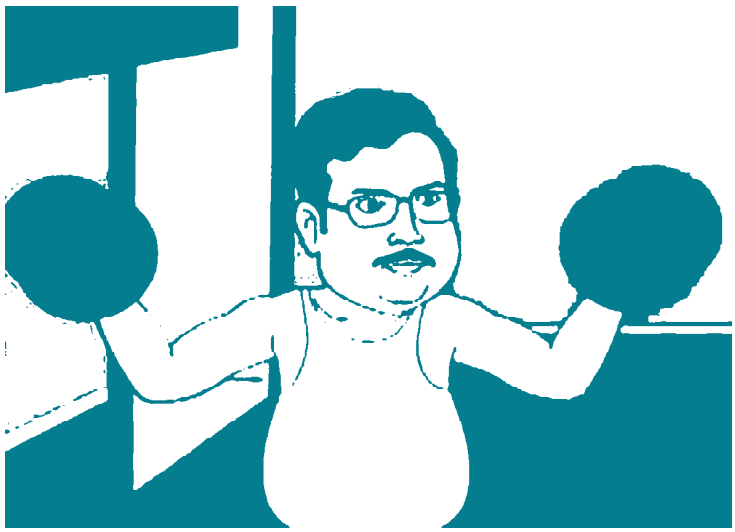
আজ বসিরহাটের সন্দেশখালির পরিস্থিতি সবাই দেখতে পাচ্ছেন। রাজনৈতিক সংঘর্ষ কিংবা ভেড়ি নিয়ে গোলমাল এইসব ছেলে ভুলোনো কথা বলে মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরালে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনা, নদীয়ার বাংলাদেশ লাগোয়া বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে, বামফ্রন্টের ৩৪, তৃণমূলের ৮, এই বিয়াল্লিশ বছর ধরে হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার হয়েছে। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা তাঁদের জমি- জায়গা দখল করে তাঁদেরই 'নিজভূমে পরবাসী' করে ছেড়েছে। বাম আমলে হিন্দুদের 'সেকুলারিজম'-এর ঠুলি পরিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ তৃণমূল যে সংগঠিত মুসলমান ভোট পায়, বামেদেরও তাদের জমানায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এই ভোটে। কিন্তু আজকের সঙ্গে তফাতটা হলো সেদিন হিন্দুভোট সংগঠিত ছিল না। সেদিন 'হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক' থাকলে তৃণমূলের থেকেও বামেদের শোচনীয় পরিস্থিতি হতো। আজ অবশ্য বামেরা অবলুপ্তির পথে, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত উভয় দিক দিয়েই।

বামেদের পাপের সীমারেখা অবশ্য টানা যায় না। সেই জন্মলগ্ন থেকে তারা মুসলিম লিগের দোসর, হবে না-ই বা কেন, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিচক্ষণতার অভাবে জন্মলগ্ন থেকেই পার্টির রাশ ভারত থেকে বিতাড়িত তাসখণ্ডের জেহাদিদের হাতে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা, চীন-পাকিস্তানের দালালি করা দলের হাতে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য শাসনের ভার পেলে, তাও দীর্ঘদিন ধরে দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা যে বিপর্যস্ত হবে তা বলা বাহুল্য। তবে হ্যাঁ, ন্যাৎসি-ফ্যাসিস্টদের মতোই এদের সংগঠিত অত্যাচারী শক্তি আগ্নেয়গিরির লাভা স্রোত সুকৌশলে সুপ্ত রাখতে পেরেছিল, মমতার জমানায় যা বেআব্রু হয়ে ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষতিকারক শক্তিটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। ■

দিদিকে ভালো থাকতে দিন প্লিজ

মাননীয় সব্যসাচী দত্ত
পুরপ্রধান, বিধাননগর পুরসভা

দাদা, অনেক আশা নিয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। সম্ভব হলে কথা রাখবেন আশা করি। আপনি আসলে অনেক দিন ধরেই দিদিকে বড়ো চিন্তায় রেখেছেন। এটা ঠিক হচ্ছে না। এখন তো দিদির মাথার



ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। এই সময়ে অন্তত দিদিকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। চারিদিক থেকে জয়শ্রীরাম শুনে দিদির রাতের ঘুম নেই। এখন শয়নে স্বপনে উনি রামসেনা দেখছেন। আর আপনি কিনা সেই সময়ে দিদিকে আরও বিব্রত করে রাখছেন। আপনি ঠিক করে বলে দিন না আপনি ঠিক কী চাইছেন। তাতে দিদিও ঠিক করে নিতে পারে আপনাকে গদ্দার বলবেন না অন্য কিছু।

এই চিঠি লেখার মধ্যেই খবর পেলাম আপনি নতুন তির ছুঁড়েছেন। 'সাধ্য থাকলে তাড়ানো হোক আপনাকে'— এই মন্তব্য করে দলের সঙ্গে আপনার 'সম্পর্ক' নিয়ে নতুন জল্পনা সামনে এনেছেন। আপনি বিধাননগরের মেয়র আবার রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক।

সব্যসাচী দত্ত আপনি দল আর রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে হেঁয়ালি করে বিতর্কে জড়িয়েছেন। বারবারই তাতে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা দানা বেঁধেছে। সম্প্রতি দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়কে নিজের বাড়িতে লুচি-আলুরদম খাইয়ে সেই জল্পনায় বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিলেন। এবার কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতিতে বিধাননগরের পুরবৈঠক বাতিল হওয়ার পরে হেঁয়ালি ছেড়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন দলীয় নেতৃত্বকে। আপনি এদিন বলেন, ''আমাকে তাড়িয়ে দেখাতে পারলে বুঝব দম আছে।'' তৃণমূল অবশ্য এখনি এ নিয়ে 'সংঘাতে' নারাজ। দলের জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ''না, না। যে আছে দলে তাঁকে তাড়াতে যাবে কেন?''

৪১ সদস্যের বিধাননগর পুরসভার বৈঠকে ২৪ কাউন্সিলরের অনুপস্থিতি ঘিরেই এই টানাপড়েনের সূত্রপাত। চেয়ারপার্সন-সহ ১৭ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈঠক বসলেও সেখানে আলোচনা কিছু হয়নি। বরং প্রকাশ্যেই তাঁদের অনেকে মেয়র পদে সব্যসাচী আপনার প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন।

আপনার বিরোধীগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে পরিচিত ডেপুটি মেয়র তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''লোকসভা নির্বাচনে তিনি কাজ করেননি। দলের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ করেছেন। তাই মেয়রের উপর আমাদের আস্থা নেই।'' অনুপস্থিত কাউন্সিলরদের 'আমাদের' হিসাবে চিহ্নিত করলেও এদিনের বৈঠকেই কেন তাঁরা অনাস্থা জানাননি? তাপসবাবু অবশ্য বলেন, ''ঘরোয়া সমস্যা বাইরে আনতে চাইনি।''

এসব অপনাদের দলের ঘরোয়া ব্যাপার। আমার নাক গলানো ঠিক হবে না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে মানতেই হবে দাদা। দিদি কিন্তু ভালো নেই। সবাই মিলে এমন গদ্দারি করলে কারও মাথার ঠিক থাকে বলুন তো!

— **সুন্দর মৌলিক**

নরেন্দ্র মোদী হিন্দুর এক মানবিক মুখ আবিষ্কার করেছেন

অতিথি কলম



রাহুল শিবশঙ্কর

রাজনৈতিক জগতের কেউ কেউ নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক জয়ের মুহূর্তগুলির দীর্ঘায়িত হওয়াকে এক শ্রেণীর বিরোধীদের কাছে দুঃস্বপ্নের রাত্রির দীর্ঘায়ন বলে বর্ণিত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারত' এই বার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেল। হ্যাঁ, হিন্দুদের মনকে ঈর্ষা ও ঘৃণার মাধ্যমে বিষিয়ে দিয়েই একাজ সফল হয়েছে। এ সমস্ত শুনলে মনে হয় হিন্দুরা যেন তাদের ক্লোদাক্ত মনের অন্দরে গোঁড়ামি আর ঘৃণাকে লালন করে আসছিল কেবল একজন লোহা থেকে সোনা বানানোর বাজিকরের অপেক্ষায় যে এসেই তাতে বিস্ফোরণ ঘটাবে। মোদী খুব ভালো ভাবেই জানতেন এই তথাকথিত 'কালা জাদুর' সীমাবদ্ধতা। ৮০-র দশকের শেষের দিকে মোদীর রাজনৈতিক গুরু এল কে আদবানী বিজেপির সভাপতি হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন নির্বাচনী ময়দানে। কৌশল হিসেবে শুধুমাত্র গোঁড়া হিন্দুত্বের সাফল্যের সীমারেখা। সেই কারণে সমগ্র নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে মোদী কেবলমাত্র হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে, গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের লাইন অনুসরণ করেই ক্ষমতায় ফিরেছেন এমনটা ভাবা একেবারেই ভুল। মোদী তাঁর সর্বব্যাপী প্রভাব কখনই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা সংবিধানের ধাঁচাকে এড়িয়ে একটি হিন্দু পাকিস্তান গড়ার দিকে ধাবিত করাননি।

তাঁর ভেতরে যদি এই ধরনের কোনো উগ্র প্রবণতা থাকত সেক্ষেত্রে তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতার নানাবিধ প্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের রামমন্দির উপহার দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বাস্তবে কিন্তু প্রতিটি জাতীয়তাবাদী হিন্দুর কাছে রামমন্দির নির্মাণ কেবলমাত্র হিন্দু গৌরবের সর্বময় নিদর্শন নয়। এটি হিন্দুরাষ্ট্র তৈরির পথে প্রথম দিকচিহ্ন। নজর করলে দেখা যাবে মোদীর শাসনকালে হিন্দুত্বের রথযাত্রা কেন্দ্র করে কোনো উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়নি। কোনো বড়ো ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর তো নেই-ই। অবশ্যই ভারতে মুসলমান আধিপত্যের অতীত নিদর্শনগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া নিয়ে কট্টরবাদীদের চাপ নিরন্তর ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলিকে সামলানো হয়েছে। শুনলে অবাক হতে হবে অতীতের মুসলমান ঐতিহ্যের সংরক্ষণের এই বিচিত্র পরিকল্পনা নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গেরুয়াধারী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাজমহল ও ফতেপুর সিক্রিকে কেন্দ্রস্থলে রেখে এই পরিকল্পনায় এক প্রাচীন ঐশ্বর্যময় সোনালি ত্রিভুজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পূর্ণ প্রকল্প রূপায়িত হলে ৫ লক্ষ চাকরি ও বছরে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে।

> "নরেন্দ্র মোদী তাঁর আপ্তবাক্যটির আর একটু বিস্তার ঘটিয়েছেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর সঙ্গে এখন 'সবকা বিশ্বাস'ও সংযুক্ত হয়েছে। এই সাম্প্রতিক সংযোজনটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ বার্তা দিতে চায় যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ আদৌ বিপন্ন নয়। মোদী সরকার তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে না।"

অবশ্যই ছিদ্রান্বেষীরা বলতেই থাকবে গেরুয়াধারীকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করে ও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে দিয়ে ব্যাপক প্রচার করিয়ে বিজেপি হিন্দুত্বের প্রবল প্রচারকদের আশ্বস্ত রেখেছে। একই প্রেক্ষিতে বিতর্কিত সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুরকে দল কেন লোকসভায় ঢোকার সহজ ছাড়পত্র তুলে ছিল? সাদা চোখে বিষয়টা যতই বিসদৃশ লাগুক না কেন এর অন্তর্নিহিত সংকেত দিল গভীর। নিজেদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি ও উচ্চাশা চরিতার্থ করতে কংগ্রেসের যাঁরা হিন্দুত্বের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে এক আসনে বসিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের কাছে একটি নির্ভেজাল শান্তির সংকেত পেল। এখানে মুসলমানদের জন্য কোনো অর্থবহ কিছু ছিল না।

অনেকেরই হয়তো নজর এড়িয়ে গেছে ২০১৪ সালে যেদিন থেকে মোদী ক্ষমতায় বসেছেন সেদিন থেকেই ভয়ংকর দ্রুততায় একশ্রেণীর সেকুলারবাদী তাঁর কার্যকলাপের ওপর এক ধরনের 'ড্রোণ অপারেশন' (ওপর থেকে নজরদারি করা) জারি রেখেছেন। নিজেদের মধ্যে চাউর করছেন সেই পুরনো কেচ্ছা দেশের সেকুলার পরিকাঠামোটা ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। আক্রমণাত্মক হওয়া তো দূরের কথা হিন্দুরা বিগত পাঁচ বছরে শুধু রক্ষণাত্মকই থেকে গেছে।

এঁরা মোদীর আর এস এস ব্যাকগ্রাউন্ড ও সেই হেতু হীনমনস্ক হিন্দু আধিপত্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর যোগ নিয়ে তীব্র বিষোদ্গার জারি রেখেছিলেন। জনমনে এমন ধারণা চালাতে চেয়েছিলেন যে দেশে তাঁর যে অগণন অনুরাগী রয়েছে তাঁরা সকলেই হিন্দু মৌলবাদী। যাঁরা এক ধরনের

নতুন ভক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান যা তাঁদের ভাষায় আদৌ মিলনাত্মক নয়, চরমভাবে বিভাজন সৃষ্টিকারী। এদের মধ্যে আবার চরমপন্থীরা মোদীর সমর্থকদের অন্তিম তকমা দিতে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল রাইট মুভমেন্টকারীদের খুন করার দল 'klu klax klan'-এর সমগোত্রীয় ঘোষণা করলেন। ছবি এঁকে বোঝালেন এরা মাথায় ঢাকা দিয়ে থাকা মুসলমানদের প্রতি অন্ধ ঘৃণাজনিত কারণে। ঘৃণা আছে দলিত, সমলিঙ্গীয়, উদারবাদী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের ওপর। শুধু তাই নয়, ঘৃণার পাত্র তারা সকলেই যারা হিন্দু রাষ্ট্রের পথের কাঁটা হতে পারে। সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ক্ষমতা ভোগ করার কি কদর্য কৌশল! ঠিক যেন প্রত্যেকটি উদারবাদী আর্বান নকশাল নয় তেমনি প্রতিটি মোদী সমর্থকও কখনই মৌলবাদী নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ মোদী সমর্থকই বিরক্ত হয়েছেন যখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কট্টর মুসলমান বিরোধীদের বিজেপি প্রশ্রয় দয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ গো সংরক্ষণের নামে নির্মম মানুষ নিধন বহু মোদী সমর্থকই বহু ক্ষেত্রে মেনে নিতে পারেননি। এ ব্যাপারে সরকারি তৎপরতার অভাব সমর্থকদের বিরক্তই করেছে।

অনেকেই বলে থাকেন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীরা যে ভাবে সদা হিন্দুত্বকে খাটো চোখে দেখাতে ও তার তীব্র নিন্দা করে হিন্দুত্বের ভাবাদর্শকে কলঙ্কিত করতে অভ্যস্ত নরেন্দ্র মোদী সেই অনন্য আঘাত পাওয়া থেকে হিন্দুত্বকে বাঁচাতে চান। কিন্তু এই আঘাতের সরাসরি প্রত্যাঘাত বা কট্টর হিন্দুত্বের রাস্তা না ধরে তিনি Hinduness যার বাংলা নিরুপণ করা ঝুঁকিপূর্ণ তাকেই বেছে নিয়েছেন। হিন্দু জাতির যে চিরকালীন গুণাবলী সেই পথে অগ্রসর হওয়া বললেই হয়তো কিছুটা বলা যেতে পারে। এই হিন্দুমনস্কতাই সমাজের বহুবিধ স্তরকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছে। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই বিজেপি'র পক্ষে যাকে এই গতানুগতিক মত বাতিল হয়ে গেছে।

বাস্তবে এই হিন্দু মনস্কতা ধর্মের পরিভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তাঁর দিল্লিতে দেওয়া বক্তৃতামালার এক অংশে সুন্দর ভাবে বলেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে যাঁরাই ভারতে বসবাস করে এই হিন্দুমনস্কতাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা কখনই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে বিভাজন বলে মনে করেন না। কেননা তাঁদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে হিন্দু দৃষ্টিকোণ ক্রিয়াশীল থাকে। মোদীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এই ভাবনা শৃঙ্খলেরই ফলিত রূপ যা তিনি বারবার আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। সকলকে নিয়েই চলতে হবে। হ্যাঁ, হিন্দুমনস্কতা সমাজে সংখ্যালঘুদের কখনই তাদের হক থেকে বঞ্চিত করার কথা বলে না। সমাজে সকলেই যাতে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী উঠে অসতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। এ বিষয়ে জাতিভিত্তিক আত্মপরিচয়ের সুযোগকে সম্পূর্ণ বিবেচনার বাইরে রাখা হয়।

সংসদ চত্বরে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনী বিজয়ের পর নরেন্দ্র মোদী তাঁর আপ্তবাক্যটির আর একটু বিস্তার ঘটিয়েছেন 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর সঙ্গে এখন 'সবকা বিশ্বাস'ও সংযুক্ত হয়েছে। এই সাম্প্রতিক সংযোজনটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ বার্তা দিতে চায় যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ আদৌ বিপন্ন নয়। মোদী সরকার তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে না।

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নির্যাস হিসেবে এটাই বলা যায় যে মোদীর সমর্থক ও অনুরাগীরা এটাই প্রত্যাশা করেন যে রাজনীতি শুধু নিজসমৃদ্ধির জন্য না হয়ে জনজীবনে সকলের সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে আশার আলো দেখাবে।

এই আশার দীপ্তিতেই সাধারণ মানুষ একদিন 'স্যুট বুট পরে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য তৈরি হতে পারে। সেদিন তার কপালে একটি তিলক থাকলেও ক্ষতি নেই। সেদিন তাকে তার জাতি সংক্রান্ত প্রশংসাপত্র দেখিয়ে চাকরির বা কোনো প্রকল্পের ঋণের আবেদন করতে হবে না। তাদের মধ্যে এমন এই আশাই প্রাণবন্ত যে সেদিন 'ভারতমাতা কী জয়' বলা কোনো ধরনের হীনমন্যতার পরিচায়ক হবে না। বরঞ্চ দেশপ্রেমিক ভারত-জনতার বিশাল অংশ সেদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তাদের অকুণ্ঠ দেশপ্রেমকেই উদ্‌যাপন করবে। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

মূল্যহীন ডিগ্রি

মাঠের মধ্যে তিনজন ইনজিনিয়ার একটা আঁকাবাঁকা পাইপের মধ্যে তার ঢোকানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই পারছিলেন না। একজন গরিব কৃষক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করছিলেন। কৃষক ইনজিনিয়ারদের বললেন— বাবু, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব? ইনজিনিয়ারদের মধ্যে একজন বললেন, আমরা ইনজিনিয়ার হয়ে চারদিন ধরে চেষ্টা করছি আর তুই করে দিবি? দেখ একবার চেষ্টা করে দেখ।

কৃষক মুচকি হেসে মাঠ থেকে একটি ইঁদুর ধরে নিয়ে এল। তারপর ইঁদুরটির লেজে তারটি বেঁধে পাইপের ভিতরে ছেড়ে দিল। ইঁদুর দৌড়ে পাইপের বিপরীত দিকে বেরিয়ে এল। কৃষক ইঁদুরের লেজ থেকে তারটি খুলে নিয়ে ইঁদুরটি ছেড়ে দিল।

ইনজিনিয়ারবাবুরা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তি করল— আর তো ডিগ্রির কোনো মূল্যই রইল না।



উবাচ



গিরিরাজ সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার মহেন্দ্র সিংহ ধোনি পুরোপুরি একজন দেশপ্রেমিক। এজন্য প্রতিবেশী দেশের কাছ থেকে ভারতের কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই। ধোনি একজন নামিদামি ক্রিকেটার এবং ঝাড়খণ্ডের গর্ব। হাতে গ্লাভস্ পরে তিনি তিনি দেশাত্মবোধকেই সম্মান জানিয়েছেন। তিনি সত্যিকারের একজন রাষ্ট্রভক্ত।"

ইংল্যান্ডে ধোনির গ্লাভসে ফৌজি চিহ্নের জন্য পাকিস্তানের সমালোচনার জবাবে



দেবশ্রী চৌধুরী
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

"পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত হত্যার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল। পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে এটি শুরু হয়েছে। দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে যা অবস্থা তৈরি হচ্ছে তা ৭২ সালের থেকেও কয়েকগুণ খারাপ। গণতন্ত্র বা আইনের শাসন বলে এখানে কিছু নেই।"

পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে মালদায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে



যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তর প্রদেশ

"অযোধ্যার সাধুসন্তদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের আশীর্বাদেই বিজেপি এত বিপুল জয় পেয়েছে। অযোধ্যাই এই জয়ের ভিত্তি।"

রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে



শ্রীমতী শবনম্ সিংহ
ক্রিকেটার যুবরাজ সিংহের মা

"ছোটোবেলা থেকেই খুব ডাকাবুকো। ম্যাচ হারলে খাওয়া বন্ধ করে দিত। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত। ছেলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করেও সফল।"

যুবরাজের অবসর গ্রহণের খবরে সংবাদমাধ্যমে।

লোকসভার নির্বাচন ও জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে

বিনয়ভূষণ দাশ

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে এই নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয়বার ভারতীয় জনতা পার্টি জম্মু ও লাদাখ অংশে সমস্ত আসনে জয়লাভ করল। রাজ্যের মোট ছটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি কাশ্মীর উপত্যাকায়, দুটি জম্মু অঞ্চলে এবং একটি আসন লাদাখ অঞ্চলে। রাজ্যের আসন বণ্টনে বৈষম্য আছে। আয়তনে জম্মু ও লাদাখ অনেক বেশি বড় হলেও কাশ্মীর উপত্যকার তুলনায় আসন সংখ্যা বেশি —লোকসভা এবং বিধানসভা উভয় ক্ষেত্রেই। কাশ্মীর উপত্যাকার মোট আয়তন ১৫,৯৪৮ বর্গ কিলোমিটার, অন্যদিকে জম্মুর আয়তন ২৬,২৯৩ বর্গ কিলোমিটার এবং লাদাখের আয়তন ৫৯,১৪৬ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে ছোট হলেও উপত্যকার আসন তিন, মোট আসনের অর্ধেক। যাইহোক, গত লোকসভা নির্বাচনের মতো এবারও ভারতীয় জনতা পার্টি জম্মুর দুটি এবং লাদাখের একটি আসনে জয়লাভ করেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো বিজেপির ভোট শতাংশ বেড়ে ৪৬.৪ শতাংশ হয়েছে। গতবার এই শতাংশ ছিল ৩৪.৪ শতাংশ। এই তিনটি লোকসভার অধীনে মোট ৪১টি বিধানসভা ক্ষেত্র আছে। এর মধ্যে ২৭টি বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে আছে। লোকসভা অনুযায়ী একটা তুলনামূলক হিসেব দেওয়া যেতে পারে। উধমপুর লোকসভা কেন্দ্রে গত ২০১৪ নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৬.৭৬ শতাংশ ভোট আর এবারে দলের ভোটের হার ৬১.৩৮ শতাংশ, যেটা দেখাচ্ছে গতবারের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবারে দল ভোট শতাংশে অনেক উন্নতি করেছে। বি জে পি নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ কংগ্রেস প্রার্থী তথা কাশ্মীরের প্রাক্তন যুবরাজ ড. করণ সিংহের পুত্র বিক্রমাদিত্য সিংহকে ৩.৫৭ লক্ষ ভোটে পরাজিত করেছেন। যদিও, কাশ্মীর উপতকায় বিজেপি মাত্র ২.৯৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রদত্ত ভোটের হারও খুবই কম, মাত্র ৮.৭৬ শতাংশ। উপত্যকার তিনটি আসনই পেয়েছে ফারুক আবদুল্লার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স। উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক পিডিপি একটিও আসন পায়নি। মাত্র ৭.৮৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনটি আসনে জয়ী হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স। ফারুক আবদুল্লা শ্রীনগর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। উত্তর কাশ্মীরের বড়মূলা কেন্দ্র থেকে মোহাম্মদ আকবর লোন এবং অনন্তনাগ থেকে হাসনাইন মাসুদি জয়ী হন। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থক পিডিপি ২০১৪ তে প্রাপ্ত ২০.৫ শতাংশ ভোটের জায়গায় মাত্র ২.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে কোনও আসনেই জিততে পারেনি। উধমপুর ছাড়া অন্য দুটি আসন, জম্মু এবং লাদাকে জয়ী হন যথাক্রমে বিজেপির যুগলকিশোর শর্মা এবং জামিয়াং শেরিং নামগিয়াল যথাক্রমে ৩০২৮৭৫ এবং ১০,৯৩০ ভোটের ব্যবধানে।

> **সময় হয়েছে বৈষম্য সৃষ্টিকারী, কাশ্মীরি পণ্ডিত, জম্মু ও লাদাখের নাগরিকদের প্রতি বঞ্চনায় সহায়তাকারী অস্থায়ী, অবৈধ কালাকানুনগুলি রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাতিল করবার।**

এতো গেল আসন সংখ্যার হিসেবনিকেশ। জম্মু ও কাশ্মীরে উপুর্যপরি দ্বিতীয়বার বিজেপির জয়ের পিছনে অন্য কতকগুলি ইঙ্গিতও রয়েছে দেশের জন্য। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, উগ্রপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি এবং তাদের সমর্থক পিডিপি একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। জম্মু, লাদাখ এবং কাশ্মীর উপত্যকার কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা বিজেপিকে সমর্থন করেছে সর্বতোভাবে। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, জম্মু ও কাশ্মীরের এই নাগরিকেরা আবারও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ভারতের মূল প্রবাহের সঙ্গে থাকতে চান; তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা চান না। তাঁরা সংবিধানের এই দুটি অবৈধ ধারার অবলুপ্তি চান। এই ধারা দুটি সংবিধান সভায় পেশ না করে রাষ্ট্রপতির এক বিশেষ 'ঘোষণা' বা 'Promulgation'-এর মাধ্যমে আইনে পরিণত করা হয় যা সংবিধান বহির্ভূত। এই ধরনের কোনও আইন পাশ করাতে হলে তা সংবিধান সভায় পেশ করা এবং পাশ করা বাধ্যতামূলক। ফলে, আইন দুটির কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। আর এই প্রসঙ্গটিই সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরে

সামনে এনেছেন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বিজেপির সভাপতি রবীন্দ্র রায়না। তিনি শীঘ্রই এই আইন দুটির অবলুপ্তি চেয়েছেন। এছাড়াও তিনি অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য যে আটটি আসন বিধানসভায় সংরক্ষিত আছে সেগুলি 'মুক্ত আসন' বা Defreeze করার দাবি জানিয়েছেন। তাছাড়াও তিনি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য যে M-Form আছে তাও প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের ৩৭০ ধারার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ অধিকার ও পৃথক সংবিধানসভা দেওয়া হয়েছে এবং ওই রাজ্যের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর ৩৫এ ধারা বলে রাজ্যকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কারা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হবে তা নির্ধারণ করার বিশেষ অধিকার। আর এই স্থায়ী বাসিন্দাদের বিশেষ অধিকার ক্ষেত্র ও সুবিধাগুলিও স্থির করা যাবে ওই ৩৫এ ধারা বলে। এই বিষয়ে গত শুক্রবার, ২৪ মে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা বলেছেন, 'তিনি (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদী) যতটা চান ততটাই শক্তিশালী হোন, কিন্তু তিনি রাজ্যের ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা সংবিধান থেকে রদ করতে পারেন না।'' এই প্রসঙ্গে শ্রীরায়না বলেছেন, যে কাশ্মীরভিত্তিক রাজনৈতিক নেতারা রাজ্যের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন এবং তিনি ৩৭০ ধারাকে 'ঘৃণার দেওয়াল' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই কারণেই রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ বর্তমান বলে মনে করছেন। শ্রীরবীন্দ্র রায়না আরও বলেছেন, ''এই দুটি ধারারই অবসান করতে হবে। ৩৫এ ধারাটি পুরোপুরি বৈষম্যমূলক। যেমন, ওমর আবদুল্লা যদি রাজ্যের বাইরের কোনও মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তাঁর স্ত্রী ধারা বলে বিভিন্ন সুযোগসুবিধার অধিকারী হবে, কিন্তু তাঁর বোন শচীন পাইলটকে বিয়ে করে রাজ্যে অবস্থিত সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।'' শ্রীরায়না আরও বলেছেন, ''ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ এবং প্রজা পরিষদের সময় থেকেই বিজেপি সংবিধানের এই ধারাগুলির বিরোধিতা করে এসেছে।''

সংবিধানের ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ ছাড়া অন্য কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান সংশোধন করতে পারেন না; একমাত্র সংসদই কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত আইনগুলি সংসদকে এড়িয়ে রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ১৯৫০, ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কাশ্মীর সংক্রান্ত ঐ আইনগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের ইচ্ছে না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর চাপাচাপিতে তিনি ওই বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করতে বাধ্য হন। এগুলির কোনও সাংবিধানিক বৈধতা নেই। আর আইনগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। তাছাড়া বাস্তবে ঐ আইনগুলির সাহায্যে উপত্যকার কিছু মানুষ, কয়েকটি পরিবার ও কিছু রাজনৈতিক নেতা ছাড়া আর কেউ উপকৃত হননি। বরং জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে এবং ভারতের বাকি অংশের মানুষের মধ্যে এক দুরপনেয় বিভেদ সৃষ্টি করেছে ঐ আইনগুলি। শুরু থেকেই ভারতীয় জনসঙ্ঘ, জম্মু প্রজা পরিষদ, বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, কাশ্মীরি পণ্ডিতগণ, লাদাখের মানুষজন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের দেশপ্রেমিক মানুষ এই আইনসমূহের বিরোধিতা করে আইনটির বিলোপ চেয়েছেন। তাই সময় হয়েছে এই বৈষম্য সৃষ্টিকারী, কাশ্মীরি পণ্ডিত, জম্মু ও লাদাখের নাগরিকদের প্রতি বঞ্চনায় সহায়তাকারী অস্থায়ী, অবৈধ এই কালাকানুন রাষ্ট্রপতির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাতিল করবার। পর পর দুবার লোকসভার নির্বাচনে উপত্যকার মুষ্টিমেয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ছাড়া সমগ্র জম্মু, লাদাখ ও কাশ্মীরি পণ্ডিতগণ তথা নির্বাচকমণ্ডলী এটাই চেয়েছেন তাঁদের মতদানের মাধ্যমে। ❙

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য
ক্ষমতালোভী বিরোধীদের নিম্নরুচির প্রচার

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতের রাজনীতিতে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। অনেক অর্থে অভূতপূর্বও বটে। বিজেপি তথা এন.ডি.এ-র বিপুল জয় সমস্ত বিজেপি বিরোধী দল বোদ্ধা বিশ্লেষকদের পর্বতপ্রমাণ ভুল প্রমাণিত করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী এক নতুন রাজনীতির সূচনা হয়েছে। নতুন, কারণ বিরোধী গোষ্ঠীগুলির ভয় ভীতিমূলক প্রচার ছিল নরেন্দ্র মোদী ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হলে সারাদেশে এক ভয়ংকর দাঙ্গা ও ডিক্টেরশিপের সূত্রপাত হবে। বিরোধীরা জানত যে এই কথা সত্য নয়, তবুও তারা অহোরাত্র তা প্রচার করে মানুষের মনে ভীতি প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, যা কিছুটা হলেও কতিপয় বুদ্ধিজীবী মানুষও বিশ্বাস করেছিলেন। এসব যদি সত্যি হয় তা হলেও এই নির্বাচনের পর নতুন রাজনীতির সূচনা হয়েছে বলা যায়। আবার মিথ্যা প্রমাণিত হলেও তা হবে নতুন ধারার রাজনীতি। নরেন্দ্র মোদীকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে (স্তালিনের নাম এরা সযত্নে এড়িয়ে যান) তারা শুধু জুজুর ভয় দেখিয়ে নির্বাচনে জিততে চেয়েছিল। তা মানুষকে প্রভাবিত করেনি। নরেন্দ্র মোদী অনেক দূরের নক্ষত্র। মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে তাদের স্থানিক নেতা-নেত্রীর মধ্যেই যে যুদ্ধে হিটলারদের দেখে সেটাই তাদের কাছে ডিকটেটরশিপের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনে বিরোধীদের চিত্রিত ছবি ও উত্থাপিত স্লোগানের তাৎপর্যহীনতা সম্পর্কে ভবিষ্যতে তাদের ভাবতে হবে। ভারতের নির্বাচনমূলক রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। এই কারণেই সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর একটি ফলকচিহ্ন হিসাবে গণ্য হবে।

এই নির্বাচনে প্রচারের ঢং ও নেতা-নেত্রীদের বাক্যরাশি ছিল একেবারেই পূর্ব অনাস্বাদিত। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এইবার আক্রমণের মাত্রা ছিল তীব্রতম যা আগে কখনও কোনো প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দেখা যায়নি। এমনকি 'বোফর্স' খ্যাত রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধেও নয়। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধ শক্তি ছিল অনেক সুশৃঙ্খল শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের নিয়ে গঠিত। রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস ছিল দুর্বল, হতচকিত ভীরু ও দিশাহীন। কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী শক্তি শুধু কথার চমকে উতরে যেতে চেষ্টা করেছে। তাদের প্রচার ছিল দুর্বল ও অতি নিম্নমানের। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রুচিহীন ও মিথ্যা। তথ্যবর্জিত ও আদালত অবমাননাকারী মন্তব্য লজ্জিত বাক্যাবলীতে আবৃত। অতীতের কঠিন নির্বাচন লড়াইকে কেন্দ্র করেও এরকম দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। এটা এই নির্বাচনের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য।

বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। তার গ্রহণযোগ্যতা ও দলের সভাপতি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা যে একেবারেই শূন্য তা সম্পূর্ণ প্রমাণিত। তার নেতৃত্বের ওপর তার নিজেরই আর আস্থা নেই। তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান,



কিন্তু কোনও বিশ্লেষণ চান না। এই সব নেতারা পরাজিত হলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতায় বিশ্বাসী নন। বাস্তবে 'কপিকলে' তুলে ধরা নেতা-নেত্রীদের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। সে অন্য প্রসঙ্গ। এই নির্বাচনে অন্যান্য আঞ্চলিক বিরোধী দলগুলি একটি 'ঐক্যবদ্ধ' গঠবন্ধনের মুখোশ পড়েছিল। তা ঝড়ের দাপটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বাস্তবে কংগ্রেস বা বিরোধী দলগুলি কোনও অবস্থাতেই আদৌ ঐক্যবদ্ধ জোট গঠনে প্রয়াসী হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলে বা রাজ্যে আপন শক্তি বর্ধনেরই ছক কষছিল। প্রায় সকলেই প্রধানমন্ত্রীর তখতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। জনগণের কাছে এই চালাকি বা বুজরুকিটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। এদের সবাই ভেবেছিলেন যে তাদের প্রত্যেকেরই প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা আছে। মায় কর্ণাটকের দেবেগৌড়াও। এদের আবার আরও একটা চেষ্টা ছিল রাহুল গান্ধীকে ক্ষমতার আশপাশে একেবারেই আসতে না দেওয়া। সুতরাং মহাগঠবন্ধনের হাস্যকর রূপ ছিল প্রকট। একটি শক্তিশালী জোটের বিরুদ্ধে কার্যত কোনও জোটবদ্ধ বিশ্বাসযোগ্য বিরোধিতাই ছিল না। এই নির্বাচনে এটা ছিল একটা বৈশিষ্ট্য। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে দুজন সক্রিয় ও সোচ্চার ছিলেন---চন্দ্রবাবু নাইডু ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা নাকাল হলেন সবচেয়ে বেশি। চন্দ্রবাবুকে অন্ধ্রপ্রদেশ অর্ধচন্দ্র প্রদান করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়েছে তার একচ্ছত্রতার অপসারণ ও দলে ফাটল। এই নির্বাচন প্রমাণ করল যে, জনগণের কাছে কোনও সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্য নেতা বা নেত্রী নেই। অতীতে নির্বাচনে পরাজয়ের পর শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেসের কোনও সর্বভারতীয় সভাপতি পদত্যাগপত্র পেশ করেননি। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী কেউ নন। রাহুল গান্ধী মাত্র দিনকয়েক আগে তাঁর মায়ের কাছ থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা এই বিষাদ মুহূর্তে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। এটাও ভারতের রাজনীতির একটি চমকপ্রদ ঘটনার সূচনা।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা কোনও উল্লেখযোগ্য 'ইস্যু' উত্থাপন করতে পারেনি। একদিকে বিরোধী নেতানেত্রীরা ব্যাক্তিগত বা দলগত লোভকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অন্যদিকে মোদীর বিরুদ্ধে কোনও ইস্যুভিত্তিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই নির্বাচন ছিল এক 'ইস্যুহীন' নির্বাচন যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। এমনকী বিরোধীরা বিজেপি দলের বিরুদ্ধেও তাদের প্রচার তেমন নিবদ্ধ করেনি। তারা তাদের সমস্ত বিষ ঝেড়েছিল ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। তারা ঘোষণাই করেছিল যে তারা অন্য কোনও কিছু জানে না, শুধু নিরন্তর মোদীকেই বিদ্ধ করে যাওয়াটাই তাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ মোদীকে প্রচারের আলোয় রাহুল গান্ধীরাই সবচেয়ে বেশি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। অতএব যা হয় অবিশ্রান্ত ব্যক্তিগত গালাগালিই ছিল বিরোধীদের হাতিয়ার। যেমন, মোদী মিথ্যাবাদী, মোদী চোর, মোদী দাঙ্গাবাজ, মোদী যুদ্ধবাজ এসব কথাতো ছিলই। এমনকী মোদী তাঁর মাকে ও স্ত্রীকে কেন দেখেন না, কেন বিবাহের পর স্ত্রীকে ছেড়ে এলেন এসব অবান্তর নিম্নরুচির কথায় বাজার গরম করতে চেয়ে এক ইতিহাস রচনা করেছে। এটা রাজনীতিতে অভূতপূর্ব। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে রাজস্থানে বিরোধীরা একবার ইন্দিরা গান্ধীর বৈধব্য দেশের ক্ষেত্রে অশুভ বলে প্রচার করেছিল। কিন্তু তা ছিল স্থানীয় ও ক্ষণিক। এই ধরনের প্রচার এদেশে কখনও হয়নি। রাহুল গান্ধী মোদীর 'চৌকিদার' তকমাকে মুখরোচক করে নতুন স্লোগান দিলেন 'চৌকিদার চোর হ্যায়'। কিন্তু রাজীবের বিরুদ্ধে বোফর্স যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল রাফায়েল চুক্তি সেরকম কোন ধারণাই সৃষ্টি করতে পারেনি। সুপ্রিম কোর্টও কোর্টের মন্তব্য বিকৃত করার দায়ে রাহুল গান্ধীকে লিখিত ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে। রাজীবের বিরুদ্ধে যে স্লোগান উঠেছিল 'গলি গলিমে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়'। তার অনুকরণে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' বুমেরাং হয়েছে। রাজীব গান্ধীর বোফর্স কেলেঙ্কারি ও ইতালীয় পারিবারিক কেলেঙ্কারির কথা মানুষের আবার মনে পড়ে যায়। গান্ধী পরিবার যারা জমি কেলেঙ্কারি (প্রিয়াঙ্কা ভড়রার পরিবার), ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় জড়িত তাদের মুখ থেকে সততার বাণী বা সতর্ক বার্তা হাস্যকর। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নরেন্দ্র মোদীর কলঙ্কহীন রাজনৈতিক চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস ছিল অক্ষম ও অশক্তের নিম্নরুচির রাজনীতি। গোটা নির্বাচন জুড়ে এটাই বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বিরোধী পক্ষের। নির্বাচনের পরেও প্রধানমন্ত্রীর কেদার-বদ্রীর গুহায় ধ্যানচিত্র নিয়েও এদের কটাক্ষও ব্যক্তিগত আক্রমণের রুচিহীন পরিচয়। যে কঠিন আত্মত্যাগ, জীবনচর্যা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সেবামূলক জীবন গঠন করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী সে সম্পর্কে যদি কোনও ধারণা না থাকে তবে অন্তত বিবেক ওবেরায়ের অভিনীত পি এম নরেন্দ্র মোদী চলচ্চিত্রটি দেখার অনুরোধ করব। রাজনীতির অঙ্গনে রাহুল গান্ধী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তা চিন্তাই করতে পারেন না। সুতরাং তাঁকে আর পাঁচটা গড়পড়তা সুবিধাভোগী রাজনীতিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনার যে চেষ্টা তারা করেছিলেন তার জন্য তাদের সম্বল ছিল ব্যক্তিগত চরিত্র হনন ও গালিগালাজ।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে ঘৃণা ও হিংসাত্মক ভাষায় আক্রমণ করে যে প্রচার করেছেন তাও নজীরবিহীন–অভূতপূর্ব। 'কান ধরে ওঠা বসা করান', 'কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া' এসব শব্দাবলী এই প্রথম কোনও নির্বাচন প্রচারে ব্যবহৃত হলো।

এই নির্বাচনে বলিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করার চেয়েও অপ্রস্তুত ছন্নছাড়া বিরোধীদের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনকে বানচাল করা বা বিলম্ব ঘটানো। তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ই ভি এম মেশিন নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করেছিল। তা নাকচ হওয়ায় VVPAT নিয়ে বায়নাক্কা তুলল। সুপ্রিম কোর্ট সহ সর্বত্র তা ব্যর্থ হলো। একদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংশয় আবার অন্যদিকে মোদীকে খড়কুটোর মতন উড়িয়ে দেওয়ার প্রচার জনমানসে দাগ কাটেনি। বিরোধীরা একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমাহার ঘটিয়েছিল। এটাও অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

সমস্তটা মিলিয়ে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রুচিহীনতার পরিচয় বিরোধীরা প্রদর্শন করলেন সেই রুচিহীন শব্দ ও বাক্যাবলীর যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে ভবিষ্যতে রাজনীতি বীভৎস রূপ নেবে। সে সম্বন্ধে সকলকেই সতর্ক হতে হবে। ■

মোদী সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ও আমার প্রত্যাশা

প্রবাল চক্রবর্তী

ভেবেছিলাম, নির্বাচনে এতোবড় পরাজয়ের পর ক'টা মাস বিরোধীরা চুপচাপ থাকবে। কিন্তু তা হল না। আর সেই সুযোগ করে দিল ভারত সরকার নিজেই। জাতীয় শিক্ষানীতিতে অ-হিন্দিভাষী রাজ্যে হিন্দি শেখানো'র কথা বলে। আর যায় কোথায়। রে রে করে মাঠে নেমে পড়ল সবাই। সরকার তৎক্ষণাৎ ওই কথাটা জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আগামী ক'মাস এই নিয়েই বিরোধীরা বাজার গরম করে রাখবে।

এখানে কিন্তু সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাওয়া হল। সত্যিই কি হওয়া উচিত ছিল জাতীয় ভাষা শিক্ষানীতি?

শশী থারুর বলেছেন, হিন্দিভাষীদের তো আর অন্য কোনো ভাষা শিখতে হয় না, যত কষ্ট শুধু আমাদেরই! এই যুক্তিটাকে ধরেই কিন্তু সমস্যাটার সমাধান করা যায়। আচ্ছা, তৃতীয় ভাষাটাকে সবার জন্য ঐচ্ছিক রাখা যায় না? সেখানে অ-হিন্দিভাষীরা যেমন হিন্দি শিখবে (এখানে হিন্দি মানে, সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি), হিন্দিভাষীরা সেরকম হিন্দি বাদে অন্য কোনো একটা ভাষা শিখবে। উত্তরপ্রদেশের ছাত্ররা শিখবে তামিল, মধ্যপ্রদেশে শেখানো হবে কন্নড়। আর সবটাই ঐচ্ছিক। পাশ নম্বরের থেকে বেশি পেলে তা যোগ হবে, পাশের নীচে নম্বর পেলে (বা কেউ যদি ঐচ্ছিক ভাষা না নেয়) কিছু যোগ হবে না। তাহলেই তো ক্ষোভের কারণের নিরাকরণ হয়ে গেল, তাই না? সবার জন্য সমান নিয়ম।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে হিন্দির বদলে সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, যার মূলে ছিলেন বাংলার মহাপুরুষরা, বিশেষ করে পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র। সেই প্রচেষ্টা মাত্র এক ভোটে হেরে যায়। সেটাকে কি আবার ফিরিয়ে আনা যায়? সংস্কৃত হলো পৃথিবীর একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ভাষা, যার গভীরতার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে প্রায় সব ভারতীয় রাজ্যই শ্রদ্ধাশীল। সংস্কৃতকে নিজের নিজের মাতৃভাষার মাতৃস্বরূপা বলে মানে সব রাজ্যই (তামিলনাড়ু বাদে)। তাই সংস্কৃত ভাষার প্রসারে কেউ বেশি বাধা দেবে না। কিন্তু সেই সংস্কৃত শিক্ষা হতে হবে যুগোপযোগী। কঠিন ধাতুরূপ শব্দরূপ বাদ দিয়ে সংস্কৃতের রসালো দিকটার আস্বাদন দিতে হবে বিদ্যার্থীদের। এই বিষয়ে ভারত সংস্কৃত পরিষদ অনেক কাজ করেছে। তাদের দশ দিন ও কুড়ি দিনের সংস্কৃত কোর্স দেশে জনপ্রিয়। সেই ভিত্তির ওপর সিলেবাস রচনা করতে হবে। আমাদের সভ্যতার হাজার হাজার বছরের উপলব্ধি সঞ্চিত আছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বইগুলোতে। সেগুলো নিয়ে কে গবেষণা করবে? যদি ভারতের বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত ভাষাটাই না জানে?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়ার



দরকার আছে। সেই ইংরেজ আমল থেকেই ভুল ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে আমাদের। এই প্রবণতা স্বাধীনতার পরে কমেনি, বরং বেড়েছে। একটি বিশেষ ন্যারেটিভকে সমর্থন করার জন্য বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তো মনগড়া ইতিহাসও লেখা হয়েছে। এর জায়গায় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস নিয়ে আসতে হবে। ইতিহাস পড়ানোর দুটো ভাগ থাকতে হবে, (১) সত্য ঘটনা ও (২) তার ব্যাখ্যা। একটা উদাহরণ দিই।

স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর মুচলেকা দিয়ে আন্দামান থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাটাকে চেপে গেলে চলবে না। সেটা যেমনটা ঘটেছিল, ঠিক তেমনটাই লিখতে হবে। তারপর বলতে হবে:

কেউ কেউ বলেন, এটা তাঁর ইংরেজ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের প্রমাণ। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও মত রয়েছে। তিনি যদি মুচলেকা না দিতেন, তাহলে তাঁকে আন্দামানেই মেরে ফেলা হতো। তার বদলে তিনি মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার দেশের কাজে লেগেছিলেন। এই সময় দেশের যুবকদের তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলেছিলেন। সেই যুবকরাই কিন্তু সুযোগ বুঝে নৌ-বিদ্রোহ করেছিল। যার পরিণতিতে শেষপর্যন্ত ভারত স্বাধীন হয়। এইভাবে উভয় পক্ষের মতামত একজায়গায় দিলে বিদ্যার্থী তার মধ্যে থেকে ঠিকটাকেই বেছে নেবে।

ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে ভালো লাগত না। ইতিহাস মানেই সাল-তারিখ মুখস্থ করা, আর ইতিহাস মানেই পরাজয়ের ইতিহাস। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পথে ইতিহাস না পড়িয়ে মহামানবদের জীবনীর মাধ্যমে ইতিহাস পড়ানো উচিত। আর সেই ইতিহাস হওয়া উচিত সমগ্র ভারতের ইতিহাস। বিবেকানন্দ থেকে শিবাজী, হরিহর বুক্ক থেকে লাচিৎ বরফকুন, সবার কথাই সমান গুরুত্ব দিয়ে জানতে হবে ভারতের শিশুদের।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার কথাও জানতে হবে ভারতের শিশুদের। কিন্তু এই বিষয়ে একটা ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। 'গণেশ হলো প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ' বা 'পুষ্পক রথ সত্যিই ছিল' এসব কথা বললে লোক হাসে। প্রতিপক্ষদের সুবিধা হয়ে যায়, আমাদের দুচ্ছাই করতে। এর বদলে এখানেও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। পুষ্পক রথের কথা প্রথমেই না বলে বলতে হবে শ্রীলংকায় রাবণের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ সিংহগিরি (সিগিরিয়া)-র কথা। সে প্রাসাদ এখনো আছে। ছ'শ' ফুট উঁচু এক খাড়াই প্রস্তরস্তম্ভের মাথার ওপর কয়েক টন ইঁট, মার্বেল ও গ্র্যানাইটের স্ল্যাব দিয়ে প্রাসাদ বানানো হল কী করে? কোনো সিঁড়ি ছাড়া কীভাবেই বা প্রাসাদের বাসিন্দারা প্রতিদিন প্রাসাদ থেকে উঠত নামত? এই প্রসঙ্গটাকে নিয়ে এসে তারপর বলা যেতে পারে রামায়ণে উল্লিখিত পুষ্পক নামক এক শঙ্কু আকৃতির বিমানের কথা, যার জ্বালানি ছিল পারদ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বললে পুষ্পক রথের সম্ভাবনার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ নিয়ে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গবেষণা করছে, তাদের থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে কিন্তু যাই আমরা পড়াই না কেন, তা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি, বিদ্যালয় শিক্ষার পর অধিকাংশ বিদ্যার্থীই কারিগরী শিক্ষার দিকে যায়। আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রচলন বাড়াতে হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি জেলায়, পরে প্রতিটি মহকুমায় কারিগরী শিক্ষার মহাবিদ্যালয় চাই। সেখানে কামার-কুমোর-সোনার থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান-কম্পিউটার মেরামতি— প্রয়োজনমতো সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এমন হওয়া দরকার, যাতে দেশের মানুষের প্রত্যক্ষ উপকার হয়। কানাইয়া কুমারের মতো অসংখ্য বিদ্যার্থী আমরা তৈরি করেছি গরিব জনগণের ট্যাক্সের টাকায়, যারা দেশের কোনো কাজে আসেনি। এই ব্যাপারটাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, আর সেটা করতে হবে মহাবিদ্যালয় স্তর থেকেই। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করতে হবে।

মহাবিদ্যালয় থেকেই যাতে বিদ্যার্থীরা নতুন নতুন আইডিয়ার রূপায়ণে ও ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহী হয়, শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনটি হতে হবে। এ যুগটা আর পুঁজিবাদের যুগ নয়। এখন পুঁজি নয়, আইডিয়াই ব্যবসার সাফল্যের মূল। ভালো আইডিয়া থাকলে, সেই আইডিয়াকে রূপায়ণ করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে মুদ্রা লোন পাওয়া কঠিন নয়। কেরানি শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে আগামী প্রজন্মকে উদ্ভাবন-মূলক শিক্ষার দিকে যেতে হবে।

সবশেষে বলি, এটা দেখা গেছে, যেখানে সঙ্ঘের শাখা আছে, যেখানে ব্যায়ামের আখড়া বা মার্শাল আর্টের স্কুল আছে, সে মহল্লায় মস্তানরা একটু সমঝে থাকে। বিদ্যার্থীদের মধ্যে মার্শাল আর্টের চর্চা ও পাড়ার মস্তানদের দাপট হলো বিপরীত আনুপাতিক। দেশ জুড়ে অপরাধের বাড়বাড়ন্ত দমন করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি, বিদ্যার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে মার্শাল আর্ট শেখানো। বিশেষ করে ছাত্রীদের। মেয়েদের আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তোলা জাতির দায়িত্ব।

সংক্ষিপ্ত করে বলতে গেলে, মোদী সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির থেকে আমার চারটি প্রত্যাশা। প্রথমত, হিন্দিভাষী ও অ-হিন্দিভাষীদের মধ্যে ভাষাশিক্ষার সমান সুযোগ। সরল সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন। দ্বিতীয়ত, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস, যা শিশু-কিশোর বয়সের উপযোগী। যা বিদ্যার্থীদের মনে দেশের গৌরব ও অখণ্ডতার ভাব জাগায়। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হোক। তৃতীয়ত, কারিগরী শিক্ষার প্রসার। জনমুখী, উদ্ভাবন-মূলক ও ব্যবসামুখী হোক মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। চতুর্থত, বাধ্যতামূলক মার্শাল আর্ট শিক্ষা। দেশের মেয়েদের আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তোলা। আশা করব, মোদীজি এই বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার দু'শো বছরের এই জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে কিশলয়ের উদ্গমের পথ করে দেবেন। মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, এ আশা তো তিনিই জাগিয়েছেন, তাই না? ■

মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'ভূত' ভেবেই জয়শ্রীরাম ধ্বনিতে ভয় পাচ্ছেন

এই বিদ্বেষ এতটাই তীব্র যে, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় নিজের প্রতি ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে পারেন অথবা প্রতিপক্ষকে চরম আক্রমণ হানতে পারেন। এবং যাই করুন না কেন, তা করে ফেলেন নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং মানসিক স্থবিরতার অনুপস্থিতিতে।

সৃজিত রায়

আমার বাড়ির বাঁধুনি অণিমার পাঁচ বছরের নাতনি ফিঙে পড়েছে মহা সমস্যায়। ও নিজের নাম বলতে চাইছে না। 'বলুন তো দাদা! কী সমস্যা!' অনিমার দুঃশ্চিন্তা দেখে বলি—'কেন সমস্যাটা কোথায়?'

—আর বলবেন না দাদা। ওর নাম জয়শ্রী রায়। তা যেদিন পাড়ার একটা দোকানে গেছে ওর বাবার সঙ্গে কেক কিনতে। সেখানে এক তৃণমূলি দাদা ওর গালটা টিপে জিজ্ঞেস করেছে—'কী নাম?' তা নাতনি আমার সবে বলেছে জয় শ্রী রা....। ব্যাস, ধুন্দুমার কাণ্ড। ওই তৃণমূলি ছোকরা তো ফিঙের বাবাকে এই মারে তো সেই মারে! 'এইসব শেখাচ্ছ? পাঁচ বছরের পুঁচকি মেয়েকে দিয়ে জয় শ্রীরাম বলতে শেখাচ্ছ?'

আমার জামাই যত বলে—'নারে বাবা, ওর নাম....' তা কে কার কথা শোনে। রেগে আগুন.... তেলে বেগুনের অবস্থা। তারপর যা হয়। পাঁচটা লোকের ভিড়। একথা ওকথা থেকে দুচারটে কু কথার আদানপ্রদান। তারপর তো মারপিট লেগে গেল তৃণমূলি আর বিজেপি-র মধ্যে। তা কোনরকমে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচি আমরা মশাই। তারপর থেকেই ফিঙে আর নিজের নাম বলছে না।

গল্পের মতো শোনালেও ঘটনাটা বাস্তব। এখন অণিমা ভাবছে, ওর নামটাই বদলে দেবে কিনা। সেখানেও তো ফ্যাচাং কম নয়। বার্থ সার্টিফিকেট-টিকেট সব বদলানো কী কম হ্যাপা!

ফিঙের অবস্থা শুনে আমার আমাদের তরুণ বয়সের একটা ঘটনা মনে পক্ষে গেল। তখন আমরা সব সদ্য সদ্য সাংবাদিকতা পেশায় ঢুকেছি। তখন আমাদেরই এক সহকর্মী একদিন একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলল—'ফোনটা করে লক্ষ্মণদাকে চাইবি। বলবি, জেনারেটর ভাড়া চাই।' আমি বললাম—মানে? জেনারেটর কী করব?

—আরে কর না ফোনটা।

করলাম। 'লক্ষ্মণদা আছেন?' বলা মাত্রই মনে হলো কানে কেই গরম সিসা ঢেলে দিয়েছে। ব্যাপরে বাপ! জীবনে অমন গালাগালি শুনিনি। তা সেই লক্ষ্মণদাকে আমরা সাংবাদিকরা কেউই চোখে দেখিনি। চিনতাম না কেউ। কিন্তু যা হয় আর কী! নিতান্তই নিরামিশ আনন্দের জন্য সাংবাদিকদের টেনশন ভরা জীবনে লক্ষ্মণদা ছিলেন আমাদের কাছে গ্রীষ্মের দাবদাহে এক পশলা বৃষ্টির মতো। রাইটার্সে প্রেস কর্নার থেকে গড়পড়তা সবাই ওই লক্ষ্মণদাকে নিয়ে সময় কাটাতো অনেকটা। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে হাওড়া পুলিস সুপার শচীন শ্রীধর আর কলকাতা পুলিসের ডি সি ডি ডি গৌতম মোহন চক্রবর্তীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ওঁরা অনুরোধ করেন—থামুন আপনারা। উনি হাফ ম্যাড ছিলেনই। এবার আপনাদের জন্য না ফুলম্যাড হয়ে যান।

প্রথম জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রেরণাদাত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফায় দফায় প্রতিক্রিয়া দেখে ওই লক্ষ্মণদার কথা ভেসে উঠল স্মৃতির পর্দায়। শুধু আমার নয়—বাংলা সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা কেউ আড়ালে কেউ প্রকাশ্যে হাসাহাসি করছে লক্ষ্মণদার প্রসঙ্গ তুলে। হাসি ঠাট্টা চলছে প্রেস ক্লাবেও সান্ধ্য আসরে। আর সোশ্যাল মিডিয়া? কত মানুষ যে কত চরিত্রের গল্প শোনাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন লিখছেন—আমরা বাণীপুর হোমের কোয়ার্টারে থাকতাম। তখন নির্মলদা নামে এক প্রাক্তন ছাত্র আসত আমাদের ঘরে চা খেতে। এমনিতে সুস্থ। কিন্তু 'আয়নায় দাগ লেগেছে' বললেই উন্মাদ হয়ে যেতেন। ঢিল ছুঁড়তেন। একবার মা চা দিয়ে বললেন, নির্মল, তুমি 'আয়নায় দাগ লেগেছে' শুনে খেপে যাও কেন? নির্মলদা একথা শুনেই রেগে চায়ের কাপ উলটে দিয়ে চলে গেলেন।

স্বপন দাস নামে একজন শুনিয়েছেন তাঁর পাড়ার শান্তি পিসির কথা যাঁকে 'পান্তা পিসি' বললেই চটে যেতেন। সঞ্জয় রায়চৌধুরী লিখেছেন 'তেঁতুল পিসি', 'মুরগি চোর' নামের মাহাত্ম্য কাহিনি। আমাদের বন্ধু শৈবাল বিশ্বাস শোনাল বাগবাজারের বিখ্যাত মোহনবাগান বুড়োর গল্প। বয়সের কোনও গাছপাথর ছিল না তাঁর। তীব্র মোহনবাগান ভক্ত। মানে ভদ্রলোকের জগৎটাই ছিল ফুটবল আর মোহনবাগান নিয়ে। তাঁকে যদি একবার বলা হতো, 'মোহনবাগান হেরেছে'— ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত। ছাগল বাচ্চা, তোদের খাইয়ে পরিয়ে রেখেছি এদেশে। আর তোরাই হারাবি মোহনবাগানকে?' বলে দু-চারটে কাঁচা খিস্তি ইত্যাদি। রজত ভরদ্বাজ মুখার্জি আবার ফেসবুকে বেশ লম্বা চওড়া একটা ভিডিয়ো সেঁটে দিয়েছেন। সেই ভিডিয়োটা এক সত্তরোর্ধ্ব গ্রামীণ বিধবার। তাঁকে 'তেষট্টি' বললেই তিনি অপরপক্ষের চোদ্দগুস্টি উদ্ধার করে ছাড়েন।

এখন আলোচ্য যা তা হলো এ সব ঘটনা থেকে তো বোঝাই যায় যে এঁরা সকলেই মানসিক ব্যাধির শিকার। কোনো একটি ঘটনাচক্রে কিছু ঘটনা বা কিছু শব্দ বা কিছু বাক্য

সম্বন্ধে এইসব মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে তাঁর মনের মধ্যে অকারণেই তৈরি হয় বিদ্বেষ। এবং এই বিদ্বেষ এতটাই তীব্র যে, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় নিজের প্রতি ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে পারেন অথবা প্রতিপক্ষকে চরম আক্রমণ হানতে পারেন। এবং যাই করুন না কেন, তা করে ফেলেন নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং মানসিক স্থবিরতার অনুপস্থিতিতে। গোটাটাই অনিচ্ছাকৃত। চিকিৎসা হয় না, কারণ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই মনে করেন না তিনি কোনও ভুল বা অন্যায় করছেন। সঠিক চিকিৎসা হলে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ওই লক্ষ্মণদা, তেষট্টি, বা মোহনবাগান বুড়োর মতো না হলেও, যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, তা খুব স্বাভাবিক নয়। ঘটনাটি যদি একবার হতো এবং তাঁর পুনরাবৃত্তি না হতো, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু ৩।৪ বার একইরকম প্রতিক্রিয়া দেখানোয়, প্রতিপক্ষের কাছে তিনি নিজেই ব্যঙ্গের শিকার হচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, যাঁরা তাঁকে দেখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিচ্ছেন, তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই দিচ্ছেন, যাতে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। যাতে তিনি গালাগাল দেন। যাতে আবার টেলিভিশন বা সোশ্যাল মিডিয়া সেসব দেখে সাধারণ মানুষও হাসে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কাছে এটা একটা অস্ত্রও। কারণ, উনি যত বেশি এধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, তত বেশি উনি লোকসমক্ষে হেয় হবেন, সম্মান হারাবেন। সবচেয়ে বড় কথা—ভোট হারাবেন।

আর একথাও ঠিক—'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শ্রীরামের জয়গান হোক অথবা রাজনৈতিক স্লোগান, তাতে প্রতিক্রিয়া জানানোর আছেই বা কী?

বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রিকায় বিভিন্নরকম প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ল। বাঙালি কবি ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সুবোধ সরকারের মতামত হলো, 'রাম কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য দেবতা। কিন্তু ২০০২ সালে অর্থাৎ গুজরাত দাঙ্গার সময় থেকেই জয় শ্রীরাম ধ্বনির যে ব্যঞ্জনা, সেটা পুরোপুরি ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই স্লোগান বিশেষ কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সূচনা করে।' তা বেশ। মেনেই নিলাম এটা ধর্মীয় রাজনীতির স্লোগান। 'জয় মা কালী' বলে কোনও রাজনৈতিক ব্যাক্তি বা দল জয়ধ্বনি দেয়, তাহলে অসুবিধা হয় না। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে আপত্তি কেন? ওটা কি বি জে পি বলে? বি জে পির কাছে আপনার নেত্রী গোহারান হেরেছেন বলে? আপনার নেত্রীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে? কলকাতার মেয়র এবং তৃণমূলের সবচেয়ে বেশি এবং বড় সুবিধাবাদী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আবার বলেছেন, 'যাঁরা জয় শ্রীরাম বলছেন, তাঁরা হাতে তরবারি নিয়ে ঘুরছেন। তখন মনের মধ্যে ভয় লাগে, গলাটা কাটা যাবে না তো?' তাই নাকি? তা কোনও ভিত্তিতেই তো চোখে পড়ল না, তরবারি হাতে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কেউ জয় শ্রীরাম বলছে। তরবারি তো শুনেছি মহরমের মিছিলে, বকরিদের মিছিলে থাকে। ভয় লাগার কথা তো তাহলে আল্লা হো আকবর ধ্বনিতেই, তাই না? তৃণমূলি শাস্ত্রবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি আবার পণ্ডিতী ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, আসলে ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে তিনি-ই রাম, যিনি সকলকে রঞ্জিত করেন, রাঙিয়ে দেন। কিন্তু জয় শ্রীরাম সম্পূর্ণভাবে বিজেপি-র স্লোগান। যদি ভয় দেখানোর জন্য জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলা হয়, তাতে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেই পারেন।' ভাদুড়ি মশাইয়ের বক্তব্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম হলো না। ভয় দেখানো মানে? কীসের ভয়? কে ভয় পাচ্ছে? উত্তর তো একটাই। ভোটে ফের রাজ্যপাট হারাবার ভয়। তাই তো! তা, প্রতিপক্ষ দরকার হলে সে ভয় তো দেখাতেই পারে, যেমন আপনার প্রিয় নেত্রী জয় শ্রীরাম বললেই জেলে পুরবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'যা কিছু মনোজ্ঞ ও সুন্দর, সেই অর্থেই রাম শব্দটির ব্যবহার। যেমন, আদর্শভাবে শাসিত মুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য রামরাজ্য। এখন আমার নিজের মনের মধ্যে যদি নেতিবাচক ব্যঞ্জনার বীজ লুকিয়ে থাকে বা আমার বিপরীতে যাঁর অবস্থান, আমার শত্রু, সে যদি আমায় উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য শব্দটি প্রয়োগ করে, তখন প্রতিক্রিয়া হতেই পারে।' শক্তিসাধন বাবুর ব্যাখ্যাটি বেশ যুক্তিসংগত। অর্থাৎ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন, তাদের ওই ধ্বনিটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উৎপীড়ন বা যন্ত্রণা মনে হচ্ছে, কারন তিনি নিজের মনের মধ্যে 'রাজ্য' সম্বন্ধে নেতিবাচক ব্যঞ্জনার বীজ পোষণ করে রেখেছেন। খুব স্বাভাবিক, সেই মানসিকতা নিয়ে আদর্শভাবে শাসিত সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য রামরাজ্যের সৃষ্টিকর্তার নামে স্লোগান সহ্য করবেন কিভাবে?

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঃ 'আমি তো বুঝতেই পারছি না, রাম নিয়ে রেগে যাওয়ার কী আছে? এই ধ্বনিকে রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে কেউ কেউ দেখতেই পারেন। তবে রাম তো আমাদের আরাধ্য দেবতা, অবতারের নাম। তা নিয়ে কেউ ধ্বনি তুললে প্রতিক্রিয়া জানানোর কিছু নেই।

কবি শঙ্খ ঘোষ অবশ্য মনে করেন রাম ও জয় শ্রীরাম সম্পূর্ণ আলাদা। জয় শ্রীরাম বিশেষ রাজনৈতিক ধ্বনি। রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ খেপাতে চাইলে খেপে যাওয়াটা ঠিক নয়।' বামপন্থী শিক্ষাবিদ ও লেখক পবিত্র সরকার বলছেন, 'ভূতের ভয় এড়াতে মানুষ বলে—রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কী? এখন শাসকের আসনে থাকা একজন মানুষের মনে হতেই পারে রাম শব্দটি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু পদে পদে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষেও খারাপ দেখায়।'

পাঁচজনের পাঁচ কথা তো শোনা হলো। কিন্তু সব শোনার পরে আমায় এক বাউল বলল, 'জানেন বাবু, নিত্যানন্দ নাকি কেউ কৃষ্ণনাম করলেই তেড়ে মারতে যেতেন। পাড়ার ছেলেরা তাই ওনাকে দেখলেই হরেকৃষ্ণ বলে চেঁচাত। কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিল নিত্যানন্দকে, 'তুমি না খেপলেই পার'। নিত্যানন্দ মুচকি হেসে বলেছিলেন 'ওদের কৃষ্ণনাম করানোর জন্যই তো আমার এই ছল।' বাউলের একথার মানে পাঠক আপনি আপনার মতো করে নেন। আমি ওসবে নেই। তবে একটা কথা খুব খিঁচ খিঁচ করছে বুকের মধ্যে। রামনামে তো ভয় পায় ভুত। মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে এখন থেকে ভুত (প্রাক্তন) ভাবছেন নাকি। আর সে জন্যই রামনাম বিরোধী এত লম্ফঝম্প! কে জানে!

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি আয়ুশ দফতরের বেহাল দশা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের দায়িত্বভার নেবার পর সমগ্র দেশে আয়ুশ বিভাগকে ঢেলে সাজিয়েছেন। এইমস-এর ধাঁচে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব আয়ুর্বেদ সাইন্স হয়েছে, আয়ুর্বেদকে গোটা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার মউ সাক্ষর করেছে। সমস্ত রাজ্যে আয়ুশ ডাক্তারদের বেতন কাঠামো বেড়েছে। রেল হাসপাতালগুলিতে আয়ুর্বেদ বিভাগ চালু হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আয়ুশ ডাক্তারদের বেতন বিভিন্ন, কেউ অস্থায়ী, কেউ আংশিক সময়ের। ফলে নতুন কোনও চাকরি বেরোলে সব ক্ষেত্রে কর্মরত আয়ুশ ডাক্তাররা নিজেদের পদ ছেড়ে নতুনটায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন, অযথা একটা রেষারেষি তৈরি হয়, পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়।

সবথেকে দুরবস্থা গ্রামীণ সদর চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত ১১৩৪ জন আয়ুশ ডাক্তারদের। এরা বিগত ১৪ বছর গ্রামে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন এবং প্রতিদিন ৬ ঘন্টা ওপিডিতে রোগী দেখে জেলা হাসপাতালের ভিড় কমাতে সাহায্য করছেন। এই ডাক্তাররা স্বাস্থ্য আধিকারিকের তকমা পেলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর থেকেও কম সাম্মানিক পান। বিগত ৬ বছরে এক পয়সাও মাইনে বাড়েনি এইসব ডিসপেনসারিতে কর্মরত ডাক্তারদের। মহিলা ডাক্তারদের মাতৃত্বকালীন ছুটিও নেই। ডিসপেনসারিগুলির দেখভালের দায়িত্ব সিনিয়ার আয়ুশ আধিকারিকের পরিবর্তে পঞ্চায়েত প্রধান ও জেলা পরিষদের হাতে দেওয়া হয়েছে, যাদের আয়ুশ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিদ্যে নেই। রাজ্য বাজেটের এই চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন আয়ুশ কর্মসূচী থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে এই রাজ্যে যেসব আয়ুশ প্রকল্প মাত্র কয়েক বছর আগে চালু হয়েছে সেখানে আয়ুশ ডাক্তাররা সঠিক পরিমাণ বেতন পান।

পঞ্চায়েত সদর চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত ডাক্তাররা দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যভবনে তাদের দাবি পেশ করার পরেও আমলাতন্ত্রের গেরোয় কোনও কাজ হয়নি। এই গ্রামীণ সদর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নত করে, কর্মরত ডাক্তারদের সরাসরি স্বাস্থ্যবিভাগের আওতায় নিয়মিতকরণ করা ও যথাযোগ্য বেতনের ব্যবস্থা করা নিতান্ত দরকার। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত গ্রামীণ আয়ুশ চিকিৎসা কর্মসূচীগুলিকে এইসব ডিসপেনসারিতে বাস্তবায়িত করলে গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হবে।

ডাঃ সমরজিত ঘটক
বি এ এম এস (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

গুন্ডারাজ খতম করা কঠিন

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ রাজ্যের কলেজগুলো থেকে গুন্ডাতন্ত্র ও মস্তানরাজ নির্মূল করতে বিগত ৩ বছর ধরে চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু গুন্ডা, বদমায়েশ ও কলেজ ছাত্রীদের সর্বনাশকারী লম্পটদের কলেজের ভেতর থেকে হটানো খুব সহজ কাজ নয়। কারণ এরা ছাত্রদের থেকে তোলাবাজি মারফত যে বিপুল টাকা তোলে তার ভাগ যেমন স্থানীয় থানা-পুলিশকে দেয়, তেমনি জামিনের জন্য উকিলদেরও দিয়ে রাখে। কলেজে যারা গার্ডের চাকরি করে তাদেরকে ওই গুন্ডা, বদমায়েশরা নিয়মিত টাকা দিয়ে থাকে। কলেজ গেটের গার্ডরা কলেজের অনেক বড়ো শত্রু, তারাই কলেজের বিভিন্ন তথ্য এইসব গুন্ডা বদমায়েশদের গোপনে সরবরাহ করে। এইসব গার্ডরুমে গুন্ডা বদমায়েশরা সকাল থেকেই আসর বসাচ্ছে—সেখানে সিগারেট, বিড়ি, মদ, খৈনি, তামাক সমানে চলছে। এই গার্ডরুমগুলো থেকেই কলেজ ছাত্রীদের উত্যক্ত করা, বিরক্ত করা এবং পয়সা নেওয়ার কাজ হচ্ছে। গৌড় বঙ্গ



বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ধর্ষ গুন্ডা, কলেজ ছাত্রছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে নিয়েছে, কাজেই গুন্ডাদের সঙ্গে কলেজ গার্ডদের এই অবৈধ লেনদেনে ইতি টানা অত্যন্ত কঠিন কাজ। উত্তর মালদার কলেজগুলোতে গার্ডরা সরাসরি ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। এইসব গার্ডদের চাকুরি সরকারি নিয়ম মেনে হয়নি—বাবার মৃত্যুর পর কোর্টে কেস করে এরা চাকরি নেয়, তারপর কলেজের ভেতর যাবতীয় অন্ধকার জগতের কাজ শুরু করে দেয়। গুন্ডারাজ খতম করা অত্যন্ত কঠিন।

শুভ্র সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ

জয় শ্রীরাম ধ্বনি ভারতের হিন্দুত্বকে এক সুত্রে গেঁথে দিল

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে ভারতবর্ষে মোট ৬০০-রও বেশি হিন্দু প্রজাতন্ত্র ছিল। সকলেই আলাদা আলাদা ভাবে রাজত্ব করত। তখন অবশ্য হিন্দু মুসলমান কোনো বালাই ছিল না। এই সব হিন্দু রাজ্যের মধ্যে কোনো একাত্ববোধ ছিল না। এরা যার যার মতো স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করত। ইসলাম আক্রমণের জয়চাঁদের হিংসার বলি হল পৃথ্বিরাজ চৌহান দ্বিতীয়। ভারতবর্ষ হারাল তার হিন্দুয়ানা। দিকে দিকে শুরু হল ইসলামের আধিপত্য। প্রায় ৯০ বছর ধরে চলা দাস বংশের স্থাপনা করেছিল কুতুবউদ্দিন আইবক। ওর নিজের রাজত্ব ছিল ১২০৬–১২১০ পর্যন্ত। এই দাস বংশই রাজত্ব করেছে ৯০ বছর। এরপর শুরু হলো খলজি বংশ। আলাউদ্দিন খলজি মালিক কাফুরের সহায়তায় দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করে। যে মালিক কাফুর ছিল

গুজরাটের একজন হিন্দু সেনা। এরা আসার পরেই ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতির বদল ঘটতে শুরু করে। মন্দির রূপান্তরিত হতে থাকে মসজিদে আর হিন্দু রূপান্তরিত হয় মুসলমানে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের ফলে বাংলা থেকে শুরু হয় ইংরেজ শাসন। তখন ভারতের মুসলমান রাজ্যগুলি আসে ইংরেজদের অধীনে। এর সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে। এই ইংরেজ আমলে ভারতকে এক সূত্রে গেঁথেছিল বন্দে মাতরম্ ধনি। এরপর ৭০ বছর কেটে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে দেশ এতগুলি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এমনকী ইসকনকে পর্যন্ত দেখানো হয়েছে ভারতের শত্রু হিসেবে। যাদের প্রধান সম্বল হরেকৃষ্ণ নাম। এত বছর কেটে গেলেও হিন্দুরা নীরবে সহ্য করে এসেছে। হিন্দুদের এই চাপা অনলে ঘৃতাহুতি দিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। ভোটের আগে হিন্দুরা বুঝতে পারল তাদের হিন্দুত্বকে। শেষ বাজিমাত করল জয় শ্রী রাম ধ্বনি। যেটা সারা ভারতবর্ষকে এক সুতায় বাঁধল।

স্বপন কুমার ভৌমিক
শান্তিপুর

কারকারে কি ঠিক করেছিলেন?

সম্প্রতি প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের একটি মন্তব্য নিয়ে দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। প্রজ্ঞা বলেছেন, তার অভিশাপে হেমন্ত কারকারকে মুসলমান উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। মালেগাঁও বিস্ফোরণে যে মোটর সাইকেলটি ব্যবহৃত হয় সেটি সাধ্বী প্রজ্ঞার নামে রেজিস্টার্ড ছিল। এছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোনও অভিযোগ ছিল না। হেমন্ত কারকারে তাকে গ্রেপ্তার করার পর মিথ্যা স্বীকারক্তি আদায়ের জন্য তার উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। এমনকী তাকে ব্লুফিল্ম দেখতে বাধ্য করা হয়। তিনি ৯ বছর জেলে বন্দি ছিলেন। জীবনের ৯টি বছর কী দুর্বিষহ তা বর্ণনার অতীত, এই পত্রলেখকের ভারতীয় জেলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আমার মতে মানুষ মানুষকে অভিশাপ দেয় না। মানুষের মধ্যে যে অমর আত্মা বিরাজ করছে সেখান থেকে অভিশাপের বার্তাটা বেরিয়ে আসে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তার শোকাতুরা জননী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন ''যে জওহরলাল আমার আদরের ছেলেকে হত্যা করেছে তার বংশ অপঘাতে নির্বংশ হবে।''

এবার পর পর মিলিয়ে দেখুন সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ ভগবানের কানে পৌঁছায় কি না। নেহেরুর পরবর্তী প্রজন্ম সঞ্জয়ের হেলিকপ্টার ভূপতিত হয়। তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রাজীব এল.টি.টি.ইর বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা অকথিত কাহিনী বইটি পড়ে দেখতে পারেন। হেমন্ত কারকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলছি তিনি প্রজ্ঞাকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করে কি ঠিক করেছেন? তার কন্যা জুঁই বলেছেন যে তার বাবা শিখিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। আমি বলছিলাম কি সব সন্ত্রাসীই কিন্তু মুসলমান।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত
কলকাতা

সঙ্ঘের দায়িত্ব বৃদ্ধি

এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন -- 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। এর মধ্যে শেষ কথাটি 'সবকা বিশ্বাস' একেবারে নতুন কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৫ সালে সঙ্ঘের পথ চলা শুরু। তারপর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সঙ্ঘের আজ এই বিশাল ব্যাপ্তি। এর পিছনে রয়েছে অগণিত কার্যকর্তার আত্মত্যাগ, যারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নীরবে নিভৃতে কাজ করে গিয়েছেন। আজকের এই বিপুল বিস্তার বহু কার্যকর্তা দেখে যেতে পারেননি। সমাজের সর্বস্তরে আজ সঙ্ঘের বিস্তার ঘটেছে। রাজানতিক ক্ষেত্র এই সমাজ ব্যবস্থারই অঙ্গ, তাই বহু স্বয়ংসেবক এই ক্ষেত্রে কাজ করছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশানের দাবি নিয়ে কাশ্মীরে গিয়ে আত্মবলিদান দিলেন, কিন্তু রেখে গিয়েছিলেন যুবক অটলবিহারী বাজপেয়ীকে। যার সুফল পরবর্তীতে দেশ পেয়েছে। অস্বীকার করা যাবে না পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বলিদানকে। এরকম আরও বহু বলিদানের ফসল আজকের ২০১৯কে সমৃদ্ধ করেছে। এবারের ভোটের ফলাফলে দুটি বিষয় স্পষ্ট। একদিকে দেশের জনগণ পাবিারবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যদিকে যারা শাসন ক্ষমতায় থেকে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে তাদের এবং তাদের সহযোগীরা জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ২০১৪ থেকেও এবারের ভোটের ফল বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও ভারতীয় জনতা পার্টির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারতন্ত্র থেকে দেশ প্রায় মুক্ত হতে চলেছে। আগামীদিনে তাদের আর ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই উদ্বিগ্ন। যারা ক্ষমতায় থেকে অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল সেই বামেরা আজ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। ২০২১ সাল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনবে আর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদলের অবস্থা অজয় মুখার্জি বা জ্যোতি বসুর দলের মতো হবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দায়িত্ব বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। এখন স্বয়ংসেবকদের হাতে দেশ বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা। তাই সেই ক্ষমতার সুফল যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ পায় তার জন্য স্বয়ংসেবকদের সচেষ্ট থাকতে হবে। দম্ভ, ঔদ্ধত্য নয়, সবার বিশ্বাস অর্জন করাই হলো ক্ষমতার সার্থকতা। সমজে এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যারা ক্ষমতার জামা গায়ে দিয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়, আবার ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জামার রংও পরিবর্তন করে। এবিষয়েও স্বয়ংসেবকদের সজাগ থাকতে হবে। এটিই এখন স্বয়ংসেবকদের বড়ো দায়িত্ব। সবার বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সবথেকে বড়ো এবং কঠিন কাজ।

রাহুল চক্রবর্তী
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।



নিঠুর-দরদি

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

‘প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখি / কেমনে বলো তাঁরে ডাকি?’— লিখেছিলেন অতুলপ্রসাদ। পাখির সঙ্গীতের কাছে তাঁর নিজের সঙ্গীতকে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল। পাখির গান তো সব কবিকেই মোহিত করে। Keats তাঁর "Ode to a Nightingale" -এ নাইটিংগেলকে বলেছেন, "Thou wast not born for death, immortal Bird! / No hungry generations tread thee down"। রোমান্টিক কবি ব্যঞ্জনায় বলতে চেয়েছেন, এত সুন্দর গায়ক পাখির মৃত্যু নেই। একটি নাইটিংগেলের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু নাইটিংগেল থেকে যাবে। অতীতে যেমন তার গান বেদনার্ত মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে।

অতুলপ্রসাদেরও নিজের গানকে পাখির গানের কাছে সামান্য মনে হয়েছে। বলেছেন, পাখি যাঁর বন্দনা গায়, আমি সামান্য গীতিকার কীভাবে তাকে বন্দনা করব?

অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভক্তকবি, সঙ্গীতের জন্য তিনি পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। লিখেছেন, ‘যখন তুমি গাওয়াও গান, তখন আমি গাই / গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।’ রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ‘জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি / নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী— / প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো।’ শুধু অতুলপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রায় সব দেশের মহাকবিই — বাল্মিকী, হোমার থেকে মিলটন পর্যন্ত— মহাকাব্য রচনা করতেন তাঁকে বন্দনা করে। কাব্য রচনার উপযুক্ত শক্তিতে কবিকে ঋদ্ধ করে তোলার অনুরোধ জানিয়ে।

কবিরা যাঁর বন্দনা গেয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন, সাধক যাঁকে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজি হন, তিনি কেমন? অতুলপ্রসাদ তাঁকে নিঠুর-দরদী বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো / এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো / আমার এ ধূপ না পোড়ালে, গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে / আমার এ দীপ না জ্বালালে, দেয় না কিছুই আলো।’ লক্ষণীয়, তিনি নিঠুর, কিন্তু তিনি দরদীও। তিনি ধূপের মতো দগ্ধ করেন, যাতে দগ্ধ ধূপের মতোই হৃদয় থেকে সুগন্ধ নির্গত হয়, ঈশ্বর দুঃখ দেন আমাদের আরও শুদ্ধ, আরও পবিত্র, আরও নির্মল করে তোলার জন্য। বেদনা যে আমাদের সুন্দর করে এতে কোনও সন্দেহ নেই। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে শ্রীবিলাস বলেছে, ‘স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।’ উপনিষদ বলেছে, ‘যখন দুঃখ ভোগ করবে তখন ভাববে তপস্যা করছ। কিন্তু দুঃখই তো শেষ নয়। পথের শেষে রয়েছে অনাবিল আনন্দ’। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে, সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।’

প্রয়োজন শুধু ঈশ্বরে নিবিড় বিশ্বাস রেখে সত্যকে আশ্রয় করে বাঁচা। তাহলেই আর চিন্তা নেই। কারণ, ঈশ্বর কল্যাণময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়, উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

‘স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।।’

— সেই পরমেশ্বর বৃক্ষরূপ জগৎ ও কালের অতীত। তাঁর মধ্যেই জগতের সৃষ্টি এবং লয়। তিনি ধর্মকে ধারণ করেন এবং অধর্মের নাশ করেন। যা কিছু ভালো এবং মহৎ, তিনিই তাদের উৎস। তিনিই এই জগতের আশ্রয়, তাঁকে নিজের আত্মারূপে জানলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। ■

ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার আগে সতর্ক থাকুন

রিংকী ব্যানার্জী

ব্যথার অনেক ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পাওয়া যায়। শুধু ফার্মেসি কেন, ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারেও পাওয়া যায় ব্যথার ওষুধ। পেশিতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বা প্রচণ্ড মাথা ব্যথা— ব্যাথার ওষুধের বোতলের দিকে হাত বাড়ানোর আগে দেখে নিন, কোন ওষুধ খাচ্ছেন এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই বা কী কী হতে পারে। ওষুধের উপর লেবেল পড়ে নিন এই ওষুধ সেবনের নিয়মগুলোও জেনে নিন। ব্যথার ওষুধ আসে দুই প্রকারে। এসিটোএমিনোফেন (ফ্যানাডল, টাইলেনল) এবং নন-স্টেরয়ডেল এন্টি ইনফ্লামেটারি (NSAIDS) ড্রাগ। দুটোই ব্যথা কমায় জ্বরও কমায়।

NSAIDS-এর মধ্যে আছে ইবুপ্রুকেন (এডডিল), এসপিরিন, ন্যাপ্রোক্সেন সোডিয়াম (এলিড)। ওষুধ নানারূপে বড়ি, ক্যাপসুল, জেলক্যাপ, তরল ইত্যাদি। ব্যথা নিবারক ওষুধের নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারটা রোগীর বয়সের উপরও নির্ভর করে। বছর কয়েক আগে পিতা-মাতারা জ্বরের জন্য বাচ্চাদের দিয়ে দিতেন বেবি এসপিরিন, কিন্তু পরে জানা গেল রেই'স সিনেড্রাম। এসপিরিনের বিষময় ফলে গুরুতর অসুখ যা মগজ, কিডনি ও যকৃৎ-এর উপর প্রভাব ফেলে। এসপিরিন বাচ্চাদের অবশ্যই দেওয়া উচিত নয়। জ্বর হলে এসিটোএমিনোকেন বা ইবুপ্রুফেন মাত্রা অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারেন। বড়রাও সতর্ক হবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

অ্যালকোহল ও ব্যথার ওষুধ— এই দুটো একত্রে সেবন বেজায় বিপজ্জনক। ব্যথার ওষুধ প্রভাব ফেলে রক্তচাপের উপর। কোন কোন ব্যথার ওষুধ উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। যাদের আগে রক্তচাপ জানা নেই, তাদের রক্তচাপ জেনে নিতে হবে। উচ্চরক্তচাপের ওষুধ যারা খান তারা নিয়মিত রক্তচাপ মাপিয়ে দেখবেন এবং কোন ব্যথার ওষুধ প্রয়োজনে নেওয়া সঠিক হবে তা ডাক্তারের কাছে জেনে নেওয়া ভালো।



পাকস্থলী সহ্য নাও করতে পারে— কোন কোন ব্যথার ওষুধ যেমন ইবুপ্রুফেন ও নেপ্রোক্সেন সোডিয়াম পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পাকস্থলীর আস্তারণে ক্ষত ও রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। অথবা কারও আলসার থাকলে তা প্রকট ও প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। তাই তেমন ওষুধ খেতে হলে সবচেয়ে কম মাত্রার ও কম সময়ের জন্য নেওয়া যায় ও ভরপেটে। প্রতিদিন প্রয়োজনে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করা উচিত। ব্যথা নাশক কিডনিকে ভারাক্রান্ত করতে পারে— কিডনি দুটো কঠোর শ্রম করে। বর্জ্য নিষ্কাশন করে এবং তরল ও ইলেকট্রোলোহার ভারসাম্য রক্ষা করে। এন এস এ আই ডি এই কাজে বাধা দিতে পারে। এসব ওষুধ নিয়মিত খেলে কিডনির ক্ষতি হতে পারে, বড় ক্ষতিও হতে পারে। ক্রনিক কিডনি রোগ থাকলে এন এস এ আই ডি খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কিচনি বান্ধব বিকল্প ওষুধও আছে।

হৃদযন্ত্রের অবস্থা কেমন— ওটিসি ব্যথা নামক হৃদরোগীদের জন্য হতে পারে দুদিকে ধার তলোয়ারের মতো। প্রতিদিন কম মাত্রা এসপিরিন রক্তকে তরল রেখে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে। আবার দীর্ঘদিন এসপিরিন নয় এমন NSAIDS ব্যবহার, বিশেষ করে উঁচু মাত্রায় এসপিরিনের রক্ত তরল করার ক্ষমতা খর্ব হতে পারে। রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, তেমনি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। যাদের কিডনি, হৃদরোগ ও সিরোসিস আছে তাদের এসব ব্যথা নাশক বারণ। প্রথমে ওষুধের উপরে লেখা লেবেল পড়ে নিন, তাহলে ভুল কম হবে।

ব্যথা নাশক ও যকৃৎ--- এসিটো এমিনোফেন জাতীয় ওষুধ নির্দেশমতো সেবন করলে নিরাপদ ও কার্যকর থাকা যায়। তবে সব ওষুধেরই ঝুকি আছে। এসিটোএমিনোপেন ব্যথা নাশক করে বেশ ভালো, তবে যকৃতের উপর প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত মাত্রা খেলে লিভারের বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই সঠিক মাত্রায় বেশি দিন নয়। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

গর্ভাবস্থায়ও ব্যথার উপশম — গর্ভবতী হলে যাই গ্রহণ করা হয় তা চলে যায় অনাগত সন্তানের কাছে। গর্ভের তৃতীয় মাসে NSAIDS দেওয়া ভালো নয়। ডাক্তারের পরামর্শে ব্যথার ওষুধ দেওয়া ভালো। পরস্পর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই ব্যথা নাশক ওষুধ সব ওষুধের সঙ্গে চলে না। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ব্যথায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষভাবে ফলপ্রসু। ■

বেনোজল পানের অযোগ্য স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর

বেনোজল আসতেই থাকবে। বেনোজল পানের অযোগ্য স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। পাকাপাকি ভাবে বেনোজল আটকাতে না পারলে বিজেপির নীতি আদর্শ— সব একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথৈ বন্যায়।

সন্দীপ চক্রবর্তী

তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বিজেপিতে যোগ দেবার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গেছে। যারা প্রতিবাদ করেছেন তাদের বেশিরভাগেরই অভিযোগ মূলত তিনটে। (১) মণিরুল সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি করেন। (২) ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থে তিনি খুন ধর্ষণ অপহরণ— সব কিছুই করতে পারেন এবং তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাই করে এসেছেন। (৩) মনিরুল ইসলাম বিজেপিতে থাকলে বীরভূমে বিজেপি শেষ হয়ে যাবে। কারণ, এই মণিরুলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বীরভূমে দুধকুমার মণ্ডলের মতো নেতা উঠে এসেছেন। এখন যদি দুধকুমারের পাশে মনিরুলকে দেখা যায় তাহলে মানুষ কিছুতেই এই সোনার পাথরবাটি-মার্কা সমীকরণ মেনে নেবে না।

বলা বাহুল্য, তিনটি অভিযোগই সত্যি। মনিরুল কোনওদিনই সভ্যভব্য রাজনীতিকদের দলে পড়েন না। কথাবার্তা যা বলেন তার অধিকাংশই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। তবে মনিরুলের অগাধ গুণপনার নিরিখে এই দুটি অভিযোগ নিতান্তই শিশুসুলভ। বস্তুত, বীরভূমের লাভপুরে যারা তৃণমূল-বিরোধী রাজনীতি করেন, মনিরুলকে তাদের থেকে ভালো কেউ চেনে না। কত বিজেপি কর্মী যে তার পোষা গুন্ডাদের হাতে মার খেয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। এইসব কর্মী যারা এতদিন মার খেয়েছেন, প্রাণ হাতে করে লাভপুর তথা গোটা বীরভূমে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তারা যদি হঠাৎ শোনেন মনিরুল তাদের নেতা— তাহালে তার থেকে দুর্ভাগ্যজনক কিছু হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই তারা এই অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন সাধারণ মানুষও। বিশেষ করে হিন্দুরা। কারণ এতকাল তারা নানা সময়ে মনিরুলের আশ্রিত মুসলমান দুষ্কৃতীদের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে ধনসম্পদ। স্ত্রী-কন্যারা ধর্ষিত হয়েছেন। হঠাৎ ভোল পালটানো মনিরুলকে বিজেপিতে দেখে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ কোন বিজেপি? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আচরিত মূল্যবোধের সঙ্গে এই বিজেপির কোনও সম্পর্ক কি আছে?

যাই হোক, প্রবল চাপের মুখে পড়ে মনিরুল ইসলাম ইস্তফা দিয়েছেন। না দিলে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে মূল্যবোধ বলে জিনিসটা আদৌ থাকবে কিনা তাই নিয়ে বড়োসড়ো প্রশ্নচিহ্ন উঠে যেতো। তবে অন্য একটি প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। মনিরুল ইসলামের অতীত সম্বন্ধে বিজেপি রাজ্য-নেতৃত্ব কিছু জানতেন না, এটা হতে পারে না। তাহলে তাকে দলে কেন নিলেন? তারা কি বোঝেননি, মনিরুলের মতো লোকের সংখ্যা দলে যত বাড়বে বিজেপি ততই



গড়পড়তা রাজনৈতিক দলে পরিণত হবে? কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির আর কোনও পার্থক্যই থাকবে না। যে নীতি ও আদর্শের রূপায়ণের জন্য বিজেপির সৃষ্টি, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। এসব কথা বিজেপির রাজ্য-নেতৃত্ব অবশ্যই জানতেন। তবুও এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

একে কি বলব, সাময়িক পদস্খলন? যাই বলি, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। আজকের রাজনীতি থেকে বিপণনকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কমবেশি সব দলই হাই-টেক বিপণনের সাহায্য নেয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখা দরকার এই বিপণন যেন সংশ্লিষ্ট দলটির নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে করা হয়। কারণ বিপণন যদি কেবলমাত্র টার্গেট অভিমুখী হয় তাহলে যে-কোনও মূল্যে ভোটে জেতার বাসনা জাগতে বাধ্য। আর যেন তেন প্রকারে ভোটে জেতা মুখ্য হয়ে উঠলে কাকে দলে নেওয়া হবে আর কাকে হবে না— সেই বিচারবোধ হারিয়ে যাবারই কথা। নেতা দাগী হোক দাঙ্গাবাজ হোক, হাতে নাতে ফল দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তাকে মালা পরিয়ে বরণ করে নিতে আর কোনও বাধা থাকে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, মনিরুল ইসলাম কি হাতেনাতে ফল দেওয়ার মতো নেতা? এখন ততটা না হলেও এক সময়ে ছিলেন। তার হাতে লাভপুরের দেড় লক্ষ মুসলমান ভোট। অন্তত লাভপুরের হিসেব উল্টে দেবার ক্ষমতা তিনি ধরেন। কিন্তু এই সামান্য প্রাপ্তির জন্য বিজেপি এত বড়ো ঝুঁকি নিয়েছে, বিশ্বাস হয় না। মনিরুলকে দলে নেওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলকে দুর্বল করা। এক সময় মনিরুল ছিলেন অনুব্রতর ডান হাত। বস্তুত, যাদের পেশিশক্তির জোরে অনুব্রতর আজকের বাড়বাড়ন্ত মনিরুল তাদের অন্যতম। কিন্তু দুই হুজুরের সেই গাঁটছড়া তো এখন আর নেই। এবং সেটা সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বোঝাও গিয়েছে। অনুব্রত একাই শতাব্দী রায়কে জিতিয়ে এনেছেন। তাহলে একজন হিন্দুবিদ্বেষী খুনির মাথায় ছাতা ধরার এই আদেখলাপনা কেন? বিজেপি কি অনুব্রতের স্টাইলে বাঙ্গলায় ক্ষমতায় আসতে চাইছে? বিজেপির রাজ্য-নেতৃত্ব তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এটাই সব থেকে বড়ো কথা। তবে বেনোজল কিন্তু আসতেই থাকবে। বেনোজল পানের অযোগ্য স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। পাকাপাকি ভাবে বেনোজল আটকাতে না পারলে বিজেপির নীতি আদর্শ— সব একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথৈ বন্যায়।

সংখ্যাধিক্যের গণতন্ত্রে বেনোজলের প্রাধান্য বিপজ্জনক

সুজিত রায়

ভারতীয় রাজনীতিতে 'ঘোড়া কেনা বেচা' শব্দযুথ যতই পরিচিত হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ততটা পরিচিত নয়। অন্তত গত সাত-আট বছর আগে পর্যন্ত এই ঘোড়া কেনা বেচা, অর্থাৎ দলবদলের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রে তেমনভাবে প্রশ্রয় পায়নি। সেটা যে দলবদলে আইনের বজ্র আঁটুনির জন্য তা নয়। কারণ ফস্কা গেরোর সুযোগ নিয়ে গোটা দেশেই রাতারাতি রাজনীতিবিদদের একাংশের গিরগিটিসম আচরণে দেশবাসী অভ্যস্ত। বিশেষে করে হিন্দি বলয়ে যেখানে রাজনীতিতে নীতির বাহুল্য কম। দুর্নীতিই বেশি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাস বলে অন্য কথা। ছুটকো ছাটকা দু-চারটে দল বদলের ঘটনা ঘটলেও ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত ঘোড়া কেনা বেচার রাজনীতি এরাজ্যে সত্যিই তেমনভাবে প্রশ্রয় পায়নি। রাজ্যের না বাম না ডান রাজনীতির সূত্রপাত ঘটালেন যিনি সেই চমৎকার রাজনীতির ভাষ্যকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই সর্বপ্রথম দেখা গেল কংগ্রেস বিধায়কদের টোপ গেলাতে। কখনও মন্ত্রিত্বের টোপ গিলিয়ে, কখনও নোটভর্তি স্যুটকেশ পাঠিয়ে, কখনও বা সোজাসুজি গায়ের জোরে বাধ্য করে বেশ কিছু কংগ্রেস বিধায়ককে শিবির পরিবর্তন করালেন। উদ্দেশ্য একটাই, যে কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে পাত্তা না পেয়ে তিনি নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছিলেন, সেই দলে একাধিপত্য কায়েম করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বিরোধীশূন্য করে তোলা। প্রথম লক্ষ্যটা যদি হয় প্রতিশোধের রাজনীতি, তাহলে দ্বিতীয় লক্ষ্যটা ছিল অবশ্যই রাজ্য-রাজনীতিতে একাধিপত্য অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই সফল হয়েছিলেন এবং কংগ্রেস-সি পি আই এম জোটের রাজনীতিকে অনেকটাই ভেঙে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় নিজের দলের বিধায়কের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন অনেকটাই। বিরোধীরা ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল পঞ্চায়েতে এবং পুরসভাগুলিতেও। ঘোড়া কেনা বেচার রাজনীতির প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে জোর দেখা যাচ্ছে এখন যখন বঙ্গরাজনীতির নতুন কুশীলব বিজেপি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে ১৮ টি আসনে জয়লাভ করে এবং ২২টি আসনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এমন একটি আবহাওয়া গড়ে তুলেছে। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ভয়ংকর প্রতিশোধপরায়ণ, স্বৈরতান্ত্রিক এবং সুযোগসন্ধানী, আখের গুছোতে ওস্তাদ রাজনৈতিক দলটিও ভাঙনের ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে, মাত্র এক বছর আগে যেসব পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে একাধিপত্য কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, সেইসব পুরবোর্ড এবং পঞ্চায়েতে এখন তাদেরই 'কুল রাখি না মান রাখি' অবস্থা। গোটা রাজ্য জুড়েই দলবদলের পালাবদল শুরু হয়েছে কারণ রাজনীতিবিদরা ধরেই নিয়েছেন, গেরুয়া ঝড় রাজ্যে পৌঁছে গেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তা সাইক্লোন হয়ে আছড়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গে। এখন জাত-বেজাতের ঠুনকো লড়াই ছেড়ে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' আপ্তবাক্যটিকে সম্বল করে দ্রুত গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সেটাই চলছে জেলায় জেলায়, আর এই দলবদলের খেলায় জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে চমক দেখাচ্ছেন সেই মানুষটিই— সেই মুকুল রায় যিনি তাঁর প্রাক্তন দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সমৃদ্ধ করেছিলেন কংগ্রেস এবং সি পি আই এম থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলির রং বদল ঘটিয়ে। এখন বিজেপি রাজনীতির অতি বড় ভরসাস্থল হিসেবে সেই একই ফর্মূলায় সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছেন রাজ্য বিজেপিকে। যেভাবে প্রতিদিন একজন দুজন করে বিধায়ক শিবির বদলাচ্ছেন, যেভাবে একের পর এক কলকাতা শহরতলির পুরবোর্ডগুলি রং বদলাচ্ছে, তাতে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে যে এই তৃণমূল আর না। ওই দলটির নাভিশ্বাস ওঠার সময় আসন্ন। একটা একটা ইঁট খুলতে খুলতে মুকুল রায় তার প্রাক্তন দলটির ভিতটুকু অনেকটাই আলগা করে দিয়েছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

> মনিরুল ইসলামের মতো রাজনীতিবিদরা কোনও আদর্শ থেকে দলবদল করছেন না। সুযোগের সন্ধান নিচ্ছেন মাত্র। গিরগিটির মতো রং বদলাতে এদের দু' মিনিটও লাগবে না।

কিন্তু সমস্যা হলো, দলটার নাম বিজেপি যা হওয়ার ভাসমান রাজনৈতিক দল নয়। যে দলটির শীর্ষে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মত কঠিন একটি আদর্শবাদী সংগঠন। যে দলটির ভিত্তি সর্বলোভহীন, জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুত্বের আলোয় আলোকিত এক বিশাল কর্মীবাহিনী, যে দলটি মনে করে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা বদল করার জন্য সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ এবং দলীয় আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। এবং যে দলটির বিশ্বাস—বীর সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো সেনানীদের আদর্শে রঞ্জিত রাজনীতিকে যে কোনও শর্তে বিকিয়ে দেওয়াটা শুধু অন্যায় নয়, ঘোরতর পাপ; ভারতীয় মূল্যবোধের শিকড়ে আঘাত হানা।

মুকুল রায় নিঃসন্দেহে বিজেপি-র রাজ্যস্তরের সংগঠনকে অনেকটাই চাঙ্গা করে



তুলেছেন নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জোরে। এই শক্তিটি তিনি অর্জন করেছিলেন তৃণমূল নেতা এবং সাংসদ হিসেবে। একথাও ঠিক, রাজ্য বিজেপি রাজনৈতিক নেতৃত্বের গয়ংগচ্ছ ঢিলেঢালা ভাবকে বিসর্জন দিয়ে তৃণমূল স্তরে দলীয় শক্তিকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাতকে অনেকটাই মজবুত করে সাহস জুগিয়েছেন মুকুল রায়। কিন্তু এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তাঁকে আবার প্রমাণ করেছে অদূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে। কারণ তিনি কখনও ক্যাডার নির্ভর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেননি। হাওয়ার ভাসমান গ্যাস বেলুনের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে উত্তর ২৪ পরগনায় অর্জুন সিংহের মতো বাহুবলী রাজনীতিবিদকে বিজেপিতে টেনে এনে প্রাথমিকভাবে সমালোচনার ঝড় সামলে নিতে পারলেও, সমস্যায় পড়লেন বীরভূমের কুখ্যাত তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামকে বিজেপি পতাকার নীচে শামিল করে। কারণ তিনি বুঝতে পারেননি, মানুষের ভোটের ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করে হাজারো বেনোজল ঢুকিয়ে চাষের জমিকে উর্বর করে তোলার রাজনীতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্ব, এমনকী রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বও মেনে নেবে না। কারণ এরাজ্যে গেরুয়া ঝড় তুলতে তাদেরও লড়াই করতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তাঁদেরই রক্ত ঝরেছে, প্রাণ গিয়েছে। ঘর-গেরেস্থালি গিয়েছে। আর সেখানে মনিরুল ইসলামের মতো লুম্পেন তৃণমূলি রাজনীতিবিদ যিনি একবছর আগেও বিজেপি কর্মীদের গোড়ালি দিয়ে পিষে মারার হুমকি দিয়েছিলেন, তাঁকে নেতৃত্বে মেনে নিতে হবে—এই চরম অপমানের তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত এবং অখণ্ডনীয়। কারণ একটা কথা তো মনে রাখতেই হবে—মনিরুল ইসলামের মতো রাজনীতিবিদরা কোনও আদর্শ থেকে দলবদল করছেন না। সুযোগের সন্ধান নিচ্ছেন মাত্র। গিরগিটির মতো রং বদলাতে এদের দু' মিনিটও লাগবে না।

সংখ্যা যেখানে ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি সেখানে বিধায়ক এবং সাংসদ ভাঙিয়ে আনার খেলাটা যে প্রয়োজন, তাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু মাত্রাটা বজায় রাখা জরুরি। সংখ্যা যেমন গণতন্ত্রের ভিত্তি, ঠিক তেমনই আদর্শও গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ফলদায়ক। সাধারণ মানুষের চোখে প্রতিটি রাজনৈতিক দল, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মূল্য এক একরকম। সস্তার রাজনৈতিক দলের মতো আমে-দুধে একাকার করে জনগণকে আঁটি বানাবার বর্ষপ্রাচীন রাজনীতিতে বিশ্বাস করার মতো দল বিজেপি নয়—এটা বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, এই বেনোজলেরা যেমন কাটা বাঁধের ফাঁক দিয়ে বিরোধী শিবিরে অনুপ্রবেশ করেছে, তেমনই এরা ব্যক্তিগত আখের গোছাতে যে কোনো মুহূর্তেই ওই কাটা বাঁধ দিয়েই বেরিয়ে যাবেন সর্বনাশ করে দিয়ে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা বা জনসঙ্ঘের নেতৃত্ব পরাক্রমশালী ব্রিটিশ রাজত্বে কোনো আপশের পথে হাঁটেননি। আদর্শকে শিরোধার্য করে তাঁরা রাজনীতিকে গড়ে তুলেছেন জাতীয়তাবোধ আর হিন্দুত্বের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে। তাদের সেই অবদানকে শুধুমাত্র সাময়িক রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য ত্যাগ করা অসম্ভব। তার মানে অবশ্য এই নয়, সংখ্যাবৃদ্ধির রাজনীতিটাও একটা স্ট্রাটেজি। কিন্তু কাদের নিয়ে বাড়াব সে সম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গি অতি আবশ্যিক। সেক্ষেত্রে দলবদলে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য কিছু শর্ত আরোপের প্রয়োজন রয়েছে। দলবদল করতে চাইছেন যারা বা আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যাঁদের তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, বিজেপি যেমন চাইছে তাঁরা সেরূপ শিবিরে নাম লেখান, তেমনি এটাও ঠিক যে রাজনীতির জগতে ঠিক থাকার জন্য তাদের ডুবন্ত জাহাজ ত্যাগ করতেই হবে। আর তা করতে হবে তাঁর বদলানো শিবিরের ইতিহাস জেনে। নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধকে মেনে নিয়েই। যে সমস্ত রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে গুরুদায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সংসদে বিজেপি সদস্যের সংখ্যা ২ থেকে ৩০২ তে পৌঁছানোর রাস্তাটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক তিতিক্ষা, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়েই আজ বিজেপি গোটা দেশে 'এক জাতি এক নাম'-এর আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করতে পেরেছে। সেই ত্যাগের মূল্যকে মনিরুল ইসলামের মত লুম্পেন রাজনীতিবিদকে তুলাদণ্ডে ওজন করার ধৃষ্টতা না দেখালেই মঙ্গল। দলের পক্ষেও। দেশের পক্ষেও। ভালো ফসল ঘরে তুলতে হলে বীজধানটা বেছে নিতেই হবে। নান্য পন্থা: অয়নায়। ■

বিজেপির দরকার একটি ছাঁকনি



আদিনাথ ব্রহ্ম

বিপুল জনাদেশ সম্বল করে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর, স্বাভাবিকভাবেই, দেশব্যাপী কর্মী-সমর্থকরা বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতেছেন। উচ্ছ্বাসে মাতবেনই— এটাই স্বাভাবিক এবং এতে অন্যায়েরও কিছু নেই। সময়ের নিয়মেই এই উচ্ছ্বাস আবার একদিন থিতিয়েও আসবে। আর তখনই শুরু হবে বিজেপির আসল পরীক্ষা, তখনই বোঝা যাবে, জয়ের আনন্দে আত্মহারা বিজেপি কি দিগভ্রষ্ট হয়েছে, নাকি সে তাঁর লক্ষ্য সম্বন্ধে অবিচল আছে? তখনই প্রমাণ হবে, আত্মতুষ্টি বিজেপিকে গ্রাস করতে পারল, কী পারল না। বিজেপির এবারের এই বিপুল জয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবদান অনস্বীকার্য। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ নির্বাচনের আগে দাবি করেছিলেন, বিজেপি এই রাজ্য থেকে এবার ২৩টি আসন লাভ করবে। বিজেপি পেয়েছে তার কাছাকাছি ১৮টি আসন। সাংগঠনিক দুর্বলতা না থাকলে বিজেপি এবার অনায়াসেই ২৩ কেন, ২৫টি আসন পেয়ে যেতে পারত। জনসঙ্ঘের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত এই রাজ্যে কী জনসঙ্ঘ, কী বিজেপি কেউই এই চোখ ধাঁধানো ফল করতে পারেনি। ফলত, জাতীয় রাজনীতির স্তরে পশ্চিমবঙ্গই এখন আলোচ্য বিষয়। লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপির এই ফলাফল রাজ্য-রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতেও অনেকখানি পরিবর্তন এনেছে। নির্বাচনী ফলাফল বেরনোর পর বিজেপি সহসাই এই রাজ্যে ভবিষ্যতের শাসনকর্তার মর্যাদা পেতে শুরু করেছে। বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেক ক্ষেত্রেই কোণঠাসা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই যে ক্ষমতায় আসবে— এমন একটা ধারণাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব ছাপিয়েও যে বিষয়টি বড়ো হয়ে উঠছে, তা হলো, তৃণমূল কংগ্রেস দলটি আদৌ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন অবধি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা। ফলাফল বেরনোর পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে ধস নামতে শুরু করেছে। সব জেলাতেই দলে দলে কর্মী ও স্থানীয় নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তো ঘোষণাই করে দিয়েছেন, গোটা জুন মাস ধরে বিজেপিতে যোগদান মেলা চলবে। আর এক বিজেপি নেতা এবং এবারের নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপির ভালো ফলাফলের মূল কারিগর মুকুল রায় বলেছেন, একশোরও বেশি তৃণমূল বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই দলবদলের ঢেউ আছড়ে পড়েছে দিল্লির আঙিনাতেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত বলেছেন, ৪০ জন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিতে যোগদান করবেন। অবশ্য শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, সিপিএম এবং কংগ্রেস কর্মীরাও বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। তবে দলবদলুদের ভিতর সংখ্যাধিক্য তৃণমূল কংগ্রেসেরই।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি দেখতে ভালোই লাগে। মনে হতেই পারে বিজেপি এই রাজ্যে আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু এই মনে লাগাটাই শেষ কথা নয়। বিজেপি কার্যালয়ে দলবদলের লাইনের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে, তা কিন্তু মনে কিছু আশঙ্কারও জন্ম দিচ্ছে। একটু পিছনে ফিরতে হবে। ২০১১ সালে সিপিএমের বিপর্যয়ের পরও তৃণমূল কংগ্রেস দপ্তরে এইরকমই দলবদলুদের ভিড় পড়ে গিয়েছিল। বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো দলে দলে সিপিএম কর্মীরা এসে ভিড় করেছিল তৃণমূলে। কলেবর বৃদ্ধি হয়েছিল তৃণমূলের। কিন্তু এই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি যে তাদের পক্ষে ভালো হয়নি— তা এখন উপলব্ধি করছে তৃণমূল। দলে অবাধ বেনোজল প্রবেশ করলে যে ভালো হয় না— তা এরও আগে উপলব্ধি করেছিল সিপিএম। সিপিএমের তিন দশকের শাসনকালে বহু বেনোজল ওই পার্টিতে ঢুকেছিল। সিপিএমও তখন কলেবর বৃদ্ধির জন্য এদের সাদরে স্থান দিয়েছিল দলে। পরে বুঝতে পেরেছিল কোন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের এরা জন্ম দিয়েছে। বোঝার পর নিজেদের রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। ততদিনে অবশ্য যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছিল সিপিএমের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দলবদলু কারা? সিপিএম থেকে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে বিজেপি— শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যারা জামা বদলাচ্ছেন— এরা কারা? প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো— এরা কোনো আদর্শের তাগিদে অন্য কোনো দলে এসে ঢুকছেন না বা কোনো আদর্শের সংঘাতে এরা কোনো দলবদল করছে না। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরই এদের দলবদলের মূল কারণ, নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থটি রক্ষা করা এবং ক্ষমতার বলয়ের ভিতর থেকে লাভের গুড় খেয়ে যাওয়া। কাজেই সিপিএমের সময়ে এরা সিপিএম, তৃণমূলের সময়ে তৃণমূল

বিজেপিকে মনে রাখতে হবে, যে ১৮টি আসন বিজেপি এই রাজ্যে পেয়েছে, সেই আসনগুলি পাওয়ার পিছনে তৃণমূল ছেড়ে আসা মনিরুল ইসলামদের কোনো অবদান নেই। বরং অবদান রয়েছে সেই হাজার হাজার বিজেপি কর্মীর— যারা এত বছর ধরে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করেও বিজেপির সংগঠন গড়ে তুলেছেন।



এবং বিজেপির সময়ে বিজেপি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই দলবদলুদের নিয়ে বিজেপি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কতটা মোকাবিলা করতে পারবে তৃণমূলের? নাকি, এতে তৃণমূল কংগ্রেসেরই সুবিধা হবে। বিজেপি নেতা মুকুল রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এই প্রসঙ্গে। গত ৪ জুন মহারাষ্ট্র নিবাস হলে দলীয় কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুকুল বলেছিলেন— 'আপনারা কি চান ২০২১ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাক? যদি তা না চান, যদি চান আগেই সরকারটা পড়ে থাক, তাহলে মমতার দলকে আমাদের দুর্বল করে দিতেই হবে।' মুকুলের এই তত্ত্বকে মান্যতা দিয়েছেন দলের সভাপতি অমিত শাহও। দিল্লির বিজেপি নেতারা মনে করেন যে, উঁচু থেকে নীচু— সর্বস্তরে যদি তৃণমূলে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অকাল নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। এছাড়াও তাদের আরো একটি ধারণা আছে যে, বহু জায়গায় বিজেপি সাংগঠনিকভাবে যথেষ্টই দুর্বল। সেই জায়গাগুলিতে যদি সংগঠন বৃদ্ধি করতে হয়— তাহলে অন্য দল থেকে লোক দিয়ে আসা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য বিজেপির একটা বৃহৎ অংশই এই অতি সরল ব্যাখ্যা মেনে নিতে আগ্রহী নন, বরং তাদের বক্তব্য যে মুখগুলির বিরুদ্ধে এতদিন লড়াই করে এসেছি, তাদেরই এখন বিজেপিতে টেনে নিলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যার খেসারত দিতে হবে বিধানসভা নির্বাচনে। এই আশঙ্কা থেকেই সম্প্রতি মনিরুল ইসলামের যোগদানের পরে দলের এক বৃহৎ অংশ প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। জাতীয় নেতৃত্বও এদের ফুৎকার এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারেননি। ফলে মনিরুল এখন কোল্ড স্টোরেজে।

আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক তা কিন্তু বলা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকা থেকে এই দলবদলুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। উত্তরবঙ্গে অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসে এমপি হয়ে যাওয়া এক নেতার অনুগামীরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, আমাদের বিজেপিতে ঢোকায় যারা বাধা দিয়েছিল, এবার তাদের আমরা দেখে নেব। অন্য দল থেকে এসে এমপি হয়ে যাওয়া এক নেতার সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে যে, তিনি এখন বিজেপির একটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হতে চাইছেন। বিজেপির অন্দরে কান পাতলেও এই বাছবিচারহীন যোগদান মেলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকট হচ্ছে। এরকমটা চললে, দলে যে চরম বিরোধ অবশ্যম্ভাবী তা না বললেও নয়।

এই সংকটের ভিতর থেকে বিজেপি বেরিয়ে আসবে— কীভাবে। প্রথমে মনে রাখতে হবে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অনেকটাই জিতেছে মোদী হাওয়ায় এবং মমতার প্রতি মানুষের বিরূপতার কারণে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই মোদী হাওয়া অনুপস্থিত থাকবে। তখন রাজ্যের ইস্যুতে ভোট হবে। ফলে, তখন বুথ স্তরে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। আর রাজ্যের ইস্যুতে যখন ভোট হবে— তখন মানুষ নিশ্চয়ই বিজেপির ভিতর এমন মুখ দেখতে চাইবে না— যে মুখগুলির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে মানুষ তৃণমূলের ওপর আস্থা হারিয়েছে। এই দুটি বিষয় মাথায় রাখলেই বিজেপি দলবদলুদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠার বদলে বরং এখন থেকেই বুথস্তরে সংগঠন জোরদার করার দিকে মনোযোগী হবে। বিজেপিকে এটা মনে রাখতে হবে, যে ১৮টি আসন বিজেপি এই রাজ্যে পেয়েছে, সেই আসনগুলি পাওয়ার পিছনে তৃণমূল ছেড়ে আসা মনিরুল ইসলামদের কোনো অবদান নেই। বরং অবদান রয়েছে সেই হাজার হাজার বিজেপি কর্মীর— যারা এত বছর ধরে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করেও বিজেপির সংগঠন গড়ে তুলেছেন। কাজেই বিজেপির আরো বেশি করে তাদের উপর আস্থা রাখতে হবে। সংগঠনে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে তাদের। দলবদলুরা কোনো দলের সম্পদ হতে পারে না কখনো। কারণ, আদর্শহীন এই দলবদলুরা নিজেদের সময় সুযোগমতো জামা বদলে নিতে পারে। কাজেই, কাল যে এরা বিজেপির জামাও খুলে ফেলবে না— তার গ্যারান্টি কী? ভাড়াটে সৈন্য নয়, নিজের অনুগত সৈনিকের ওপর ভরসা করেই ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন লড়তে নামা উচিত বিজেপির। সেই সঙ্গে বিজেপিকে এও মনে রাখতে হবে— বিজেপি দলটির একটি আদর্শ রয়েছে, তার কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে। বেনোজলের আধিক্যে সেই আদর্শ এবং কর্মসূচি যেন ধুয়ে মুছে না যায়। আবার এটাও ঠিক, রাজনীতিতে রণকৌশলও জরুরি। সেই রণকৌশলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, প্রতিপক্ষ শিবিরকে ভাঙিয়ে আনতেই হবে তাকে দুর্বল করার জন্য। রামায়ণে স্বয়ং রামচন্দ্রও তাঁর প্রতিপক্ষ শিবিরকে ভাঙিয়েছিলেন। কাজেই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকেও একই উপায়ে দুর্বল করে দিতে হবে। এই রণকৌশল মাথায় রেখেই অমিত শাহ, মুকুল রায়রা বারবার দল ভাঙানোর কথা বলছেন। কাজেই দল ভাঙবেই। অন্য দল ভেঙে বিজেপিতে লোক ঢুকবেই। শুধু বিজেপির দরকার একটি ছাঁকনি। যে ছাঁকনি বালি-কাঁকর আটকে দেবে। ■



ও পিসি তুই চলে যা, জয় বাংলায় চলে যা, হেতায় তোকে...



সাধন কুমার পাল

দেশের আর কোনো রাজনীতিবিদ এখনো পর্যন্ত জয় শ্রীরাম স্লোগানকে গালাগাল মনে করেননি, যারা এই স্লোগান তুলেছেন তাদের ক্রিমিনাল বলে আখ্যা দেননি। এই স্লোগানের মোকাবিলায় মমতা প্রথমে জয়হিন্দ স্লোগান দিতে বলেন। পরে যখন বুঝলেন জয় শ্রীরাম জয়হিন্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ জয় শ্রীরামওয়ালারা অনায়াসেই ইসলামি গন্ধহীন স্লোগান জয়হিন্দ বলতে শুরু করবেন তখন তিনি মত পরিবর্তন করে জয় হিন্দের জায়গায় প্রতিবেশী ইসলামিক বাংলাদেশের 'জয় বাংলা' স্লোগান আমদানি করলেন। একাত্তরে পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ ছিনিয়ে আনার সময় মুক্তি ফৌজের স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'। ভারতের বন্দে মাতরমের মতো এখনো বাংলাদেশের অন্তরাত্মার স্লোগান জয় বাংলা। এর আগে একাধিকবার এ রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে বাংলা রাখার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে বাংলা রাখার প্রয়াস ও জয় বাংলা স্লোগান শোনার পর কেন জানি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে শোনা 'লাল পাহাড়ির দেশে যা'-এর রিমেক 'ও পিসি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা হেতায় তোকে মানাইছে না রে, এক্কে বারে মানাইছে না রে...' মনে পড়ছে। নির্বাচনের সময় সভ্যতা ভব্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে জেহাদিদের মনের ভাষায় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গাল দিয়েছেন, অপমান করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট বা নির্বাচন কমিশনে না গিয়ে ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি করে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের আমজনতা তথা আন্তর্জাতিক মহলে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছেন। একটু বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে মমতার কার্যশৈলী অনেকটা আরবান নকশালদের মতো— উপরে গণতন্ত্র, প্রগতিশীলতার ছাপ ভেতরে ভয়ংকর।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পরও রণংদেহি মমতা। নৈহাটি-ভাটপাড়ায় গোলমালের জেরে ভয়ানক খাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নির্বাচন কমিশন চলে গিয়েছে, এখন আমার হাতেই সবকিছু। কাউকে ছাড়ব না। জানবেন রেগে গেলে আমি ভয়ংকর'। ভাটপাড়ার ধরনামঞ্চে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে কিছু লোক 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন। এতে মমতা ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে হনহন করে এগিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমার খাবে, পরবে আর গোলমাল পাকাবে? সবকটাকে তাড়িয়ে ছাড়ব। সব ডাকাত, ক্রিমিনাল'। জয় শ্রীরাম ধ্বনির মোকাবিলায় তৃণমূল এখন থেকে জয়হিন্দ ধ্বনিকে হাতিয়ার করবে। মমতার নিদান, কেউ ফোন করলে জয়হিন্দ বলুন। দেখা হলে জয়হিন্দ বলুন'। পরে নৈহাটির ধরনামঞ্চ থেকে বলেন, 'গাড়ির সামনে এসে গালাগালি করছে! সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতে পারতাম। লোকগুলিকে চিনে রেখেছি।'

মুখ্যমন্ত্রীর মতো রাজ্যে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকা একজন ব্যক্তি এরকম ভাষায় কথা বলতে পারেন কিনা, কিংবা সভ্য সমাজের সদস্য হয়ে একজন সাধারণ ব্যক্তিও এই রকম ভাষায় কথা বলতে পারেন কিনা তা বিচারের ভার না হয় পাঠকের দরবারেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাজ্যে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আছেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার প্রয়োগও আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু মাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গালি মনে হওয়ার জন্য 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি' দেওয়া অপরাধ। এই অপরাধের জন্য পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কেস দিচ্ছে। মজা করে মানুষ বলছেন পশ্চিমবঙ্গে কাজীর শাসন চলছে। কারণ কাজীর শাসনে চৈতন্য মহাপ্রভুকে

হরেকৃষ্ণ মহানাম করতে বারণ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য মহাপ্রভুর অহিংস অভ্যুত্থানের চাপে প্রাণভিক্ষে চেয়ে কাজি নিষ্কৃতি পান।

জানি না 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি' নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর স্টাইলে পশ্চিমবঙ্গে অহিংস অভ্যুত্থান হবে কিনা। তবে টেলিভিশনের পর্দায় মুখ্যমন্ত্রীর জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তার নেমে তেড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আমার বেশ কিছু ঘটনা মনে পড়ছে। হয়তো বা এই সমস্ত ঘটনা থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি' সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ছাত্রাবাসে কেউ একজন বুঝতে পারল কম্পিউটার সাইন্সের এক নবাগত পড়ুয়াকে বাঘা বললে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়। কখনো কখনো তেড়ে আসে। জানা জানি হওয়ার পর অনেকেই একটু মজা নেওয়ার জন্য বাঘা বলেই ছুটে পালাতো। আড়াল থেকে যারা বাঘা বলে চিৎকার করতো বাঘা তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করত। এক সময় এমন হলো যে ছাত্রাবাসের শুধুমাত্র 'বেয়াদপ' ছাত্ররা নয় নিপাট ভদ্রলোক আবাসিকরাও একটু মজা নেওয়ার জন্য বাঘা বাঘা বলে চিৎকার করে উঠতো। শেষে যাতনা সহ্য করতে না পেরে বাঘা ছাত্রাবাস ছেড়ে দিল। তাতেও কিন্তু নিষ্কৃতি মিলল না। কারণ বাঘা এতটাই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল যে ডিপার্টমেন্টে, ক্যাম্পাসে ওকে দেখলেই সবাই বাঘা বাঘা বলে চিৎকার করে উঠতো। এমনকী অধ্যাপকরাও নীচু স্বরে নিজেদের মধ্যে বাঘা বলে হাসি মজা করতো। কিছুদিন পর দেখা গোল বাঘা আর ক্যাম্পাসেই ঢুকছে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঘার আর পড়া সম্ভব হলো না।

এবার কলেজের একটি ঘটনা বলি। বাণিজ্য বিভাগের এক নতুন তরুণী অধ্যাপিকা ক্লাসে ঢুকে দেখলেন ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে একটি উলঙ্গ মেয়ের ছবি আঁকা রয়েছে। ছাত্ররা মুখ টিপে টিপে হাসছে। সবাই ম্যাডামের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। অধ্যাপিকা ক্লাসে ঢুকে



সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের দায়বদ্ধতা থেকেই হয়তো মমতা জেনে বুঝেই এই ধরনের ভারসাম্যহীন আচরণ করছেন। অর্থাৎ জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা এত সিরিয়াস হয়ে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের আবেগকে বিশ্বাসকে আহত করে এ রাজ্যের মৌলবাদী জেহাদিদের বার্তা দিতে চাইছেন।

শান্তভাবে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চক হাতে নিয়ে উলঙ্গ ছবিটিতে শাড়ি পরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন 'এবার বলোতো কেমন লাগছে?' সমস্ত ক্লাস নির্বাক। অধ্যাপিকা বলতে লাগলেন ছবিটি যে এঁকেছে সে ভালো শিল্পী হলেও ওর ভাবনায় কিন্তু একটু ভুল হয়েছে। কারণ কোনও বাথরুমের দৃশ্যে আগের ছবিটি উপযোগী ছিল কিন্তু এটা শ্রেণীকক্ষ, এখানে পোশাক-আশাকের প্রয়োজন আছে। ক্লাসে সবাই মাথা নীচু করেই কথাগুলি শুনছিল। সেদিনের পর থেকে আর কোনোদিন ওই অধ্যাপিকাকে কোনো রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

এবারের লোকসভা নির্বাচন চলার সময় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে অনেক জায়গাতেই মোদী মোদী ধ্বনি শুনতে হয়েছে। মোদী মোদী ধ্বনি শুনে প্রিয়াঙ্কা তেড়ে গিয়েছেন এমন কথা শোনা যায়নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক জনসভায় যাওয়ার সময় রাস্তার পাশের জনতা মোদী মোদী বলে চিৎকার করতে থাকলে প্রিয়াঙ্কা গাড়ি থেকে নেমে মোদী ভক্তদের শুভেচ্ছা দেন, হাত মেলান, হাসি মুখে ছবিও তোলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মোদী ভক্তরাই ব্যাক ফুটে চলে যান। একই ঘটনা কলকাতায় মদন মিত্রের রোড শোয়ে হয়েছে। রোড শো চলাকালীন যারা মোদী মোদী বলে চিৎকার করছিল তাদের ব্যাপারে সংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মদন বলেন ওরা মুখে মোদী মোদী বললেও ভোট আমাকেই দেবে। ব্যাপারটি কিন্তু ওখানেই মিটে গেছে। এই সমস্ত ছোটোখাটো বিষয় মমতা বোঝেন না তা হয়তো নয়। সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের দায়বদ্ধতা থেকেই হয়তো তিনি জেনে বুঝেই এই ধরনের ভারসাম্যহীন আচরণ করছেন। অর্থাৎ জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা এত সিরিয়াস হয়ে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের আবেগকে বিশ্বাসকে আহত করে এ রাজ্যের মৌলবাদী জেহাদিদের বার্তা দিতে চাইছেন। তবে এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু আট থেকে আশি সবাই হাসি মশররা করছেন এবং বলছেন বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। ■

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের গ্রীষ্মকালীন শিবির

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের প্রথম বর্ষ প্রশিক্ষণ শিবির গত ১৩ মে শুরু হয় উত্তরবঙ্গের পাথরঘাটা সারদা শিশুতীর্থে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৪১ জন সেবিকা শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. সুস্মিতা দত্ত পাল, সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর এবং ক্ষেত্রীয় সম্পর্ক প্রমুখ ঋতা চক্রবর্তী। শিক্ষিকা হিসেবে ১০ জন প্রশিক্ষিতা সেবিকার সঙ্গে পূর্ণ সময় শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার কেন্দ্র, যোগ কেন্দ্র ও আত্ম



সুরক্ষা কেন্দ্রের অখিল ভারতীয় প্রমুখ শ্রীমতী মাধুরী মারাঠী। এছাড়াও পূর্ণ সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সঞ্চালিকা রিনা সেন চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ কার্যবাহিকা গরিমা বেঙ্গানি, উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সহ কার্যবাহিকা পুতুল শর্মা এবং দার্জিলিং জেলা কার্যবাহিকা সান্তা পল। ২৫ মে বিকেলে সেবিকাদের পথসঞ্চলন শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ২৭ মে শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান আতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পাথরঘাটা হাই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষিকা শ্রীমতী মল্লিকা বর্মন। এদিন প্রশিক্ষিতা সেবিকাদের দ্বারা বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়।

ডায়মন্ডহারবারে হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণের প্রতিবাদে ব্যাঙ্গালোরের বাঙ্গালিদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত লোকসভা ভোটের সময় পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ডহারবার এলাকার বেশ কয়েকটি হিন্দু গ্রামে জেহাদিদের আক্রমণের প্রতিবাদে গত ১৮ মে ব্যাঙ্গালোর শহরে বসবাসকারী হিন্দুরা সেভ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয়। সমাবেশে বিশেষ ভাবে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

ফরাক্কায় উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত প্রবোধন শিবির

উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গত ২৬ থেকে ৩ জুন উত্তরবঙ্গের সপ্তদিবসীয় আবাসিক সংস্কৃত প্রবোধন বর্গ অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্যারেজের প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠে। বর্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন করেন প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধানাচার্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪২ জন শিক্ষক-প্রবন্ধক নিরন্তর পরিশ্রম করে বর্গকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। বর্গ সংযোজক এবং শিক্ষণ প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শিক্ষাপ্রমুখ ড. সুমন্ত প্রামাণিক ও কোচবিহারের সুশান্ত বর্মণ। বর্গে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক কমল শর্মা। অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ জে. নন্দকুমার দুদিন বর্গে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ করেন। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ পাণি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্ঘচালক শুকদেব ভকত ও উত্তরবঙ্গের সাহিত্য প্রমুখ সিদ্ধিনাথ পাঠক।



শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

গত ২ জুন বীরভূম জেলার সিউড়ি নগরের স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা তাদের ১১৫ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে সাধক বামাক্ষ্যাপার পবিত্র জন্মভূমি আটলার ৮৩ বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উমাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মাল্যদানে ভূষিত করেন জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। হাত-পা ধুইয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে পুজো করেন তাঁর বড়ো বউমা শ্রীমতী চন্দনা চট্টোপাধ্যায়। মিষ্টি, ফল, উত্তরীয় ও মানপত্র দিয়ে বরণ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পিতৃদেবের উদ্দেশে অনুভব ব্যক্ত করেন তাঁর পুত্র সুখময় চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। বামাক্ষ্যাপা মন্দিরের পূজারি-সহ গ্রামবাসীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দেরাদুনে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণী বৈঠক

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (ABRSM) রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ৪,৫ জুন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। পশ্চিমবঙ্গে থেকে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক কৃষ্ণ সরকার, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদক আশিস কুমার মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ দাস, বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সহ সভাপতি ও রাজ্য সম্পাদক অনিমেষ মণ্ডল ও কানুপ্রিয় দাস এবং সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ■

যোগ এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এক বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়



ডাঃ আর. এন. দাশ

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং যোগের মধ্যে কোনো বিরোধাভাস নেই। কারণ উভয়ই একান্ত ভাবে সার্বজনীন, যুক্তিসম্মত এবং বিজ্ঞানযুক্ত। আগামীদিনে এই দুটি বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক 'হোলিস্টিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' গড়ে উঠতে পারে যা আমাদের মনোশারীরিক বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারবে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যবিভাগের কাজ অনেক সহজ হবে। আজকের দিনে দেখা যায় এমনকী শহরের হাসপাতালগুলিতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স ও আয়ার একান্তই অভাব। সরকারি হাসপাতালে ওষুধ নেই, ল্যাবরেটারিতে টেকনিশিয়ান নেই। এই সব সমস্যার সহজ সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই করা যায় 'হোলিস্টিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের' মাধ্যমে। যোগ এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি কখনই একে অপরের প্রতিযোগী নয়, বরং পরিপূরক। আমাদের প্রাচীন বেদভিত্তিক যৌগিক পদ্ধতিতে আছে সার্বিক আহার, বিহার, প্রথা ও পরিবেশের এক উন্নত বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়। আধুনিক অ্যালোপাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র এসেছে ইউরোপীয় সভ্যতার ফলস্বরূপ। অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফার্মাকোলজির সমন্বয়ে তৈরি আধুনিক যুগের এটি এক বিশেষ অবদান। এতে আছে দেহের প্রতিটি কোষ, কলা এবং অঙ্গের বিস্তৃত ভৌতিক বিবরণ। কিন্তু মনে রাখতে



হবে, দেহের প্রতিটি কোষেই আছে জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যা ভৌতিক শারীরবিদ্যা স্বীকার করে না। কেননা তাকে ল্যাবরেটরিতে দেখা যায় না বা প্রমাণ করা যায় না ভৌতিক যন্ত্রের সাহায্যে। খালি চোখে তো 'ইনফ্রারেড রে' দেখা যায় না, তাই বলে কি তার কোনো অস্তিত্ব নেই? বাতাসকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। আজকে আমাদের লড়াই করতে হয় অনেক প্রকার দীর্ঘমেয়াদি রোগের সঙ্গে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, সন্ধিপ্রদাহ বা দুরারোগ্য এইডস ব্যাধি। এগুলো কিন্তু আজকের আধুনিক যুগের ক্ষণস্থায়ী আনন্দদায়ক জীবনশৈলীর প্রতিফল। অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন এইসব রোগকে একেবারে নির্মূল করতে পারে না। তাই আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার অত্যাধুনিক গবেষণার বিষয় হলো ঐতিহ্যগত প্রাচীন ভেষজ ও যৌগিক পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে যোগ এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। কিন্তু আমাদের এই দুই পদ্ধতির সেতুবন্ধন খুঁজতে হবে।

আয়ুর্বেদ এবং যোগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন দেখা যায় ত্রিদোষ, ত্রিগুণ, চক্র। নাড়ীর ধারণা নিয়ে গঠিত হয়েছে এই দুই শাস্ত্র। উভয়েই স্বীকার করে নিয়েছে দেহ, মন আর আত্মার অস্তিত্বের কথা। এই পদ্ধতিই স্বীকার করে এই ভৌতিক শরীর, চারিদিকের পরিবেশ এবং অদৃশ্য এক দৈবীশক্তির জন্যই আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। উভয় শাস্ত্রই স্বীকার করে শুদ্ধ আহার আর পরিমিত বিহার এবং নিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন আচরণ দ্বারাই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'সর্বাঙ্গীণ শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য'। আধুনিক যুগের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলির উপাচার সম্ভব আধ্যাত্মিকতার উন্নতি করে। আর তা সম্ভব হবে যোগের অনুশীলনের দ্বারা।

যৌগিক অ্যানাটমি ও ফিজিয়োলজি ঃ

অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রের মতোই কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির যৌগিক অ্যানাটমি আর ফিজিয়োলজি আছে এই শরীরে। এখানে স্থূল শরীর ছাড়াও আছে এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর যা মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ দ্বারা গঠিত। এই পাঁচটি মিলে তৈরি হয় পঞ্চকোষের তত্ত্ব। এই রকমই যোগে আরও উল্লেখিত আছে নাড়ী, চক্র আর বিন্দুর অ্যানাটমি আর ফিজিয়োলজি। সর্বাঙ্গীণ শরীরতত্ত্বকে জানতে হলে এই সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞানানুশীলনের একান্ত প্রয়োজন আছে। আর তা না হলে স্বয়ংকে জানা অপূর্ণ থেকে যায়।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ যোগাচার্য মহেশ যোগী বৈদিক শাস্ত্রের অনুসরণে, এদেরই 'কম্পুটেশন আর পারমুটেশন' করে মানুষের চেতনা আর বুদ্ধিমত্তাকে ৩৭ প্রকারে ভাগ করেছেন। যেমন— থ্যালামাসের সঙ্গে ন্যায় এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের স্নায়ুর কার্যকলাপের সমন্বয় দেখান হয়েছে তাঁর গবেষণায়। ডাঃ জর্জ ফুয়েরস্টাইনের লেখা বিখ্যাত পুস্তক, 'দ্য সাম্বালা গাইড টু যোগা'-তে বলা হয়েছে, আধুনিক যুগের পদার্থবিদরা যে অণু-পরমাণুর কম্পন ও শক্তির অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন মাত্র অল্প কিছুদিন আগে, কিন্তু বহু প্রাচীনকালেই ভারতীয় ঋষিরা ব্যাখ্যা করে গেছেন শরীর, মন এবং আত্মার মহাজাগতিক অভিব্যক্তির মধ্য অনুভূতি। যেমন একটা সহজবোধ্য উদাহরণ হলো, যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে মনকে হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর কেন্দ্রীভূত করে উত্তাপ সৃষ্টি করা যায় শুধুমাত্র শরীরের রক্তসংহবনকারী নাড়ীগুলিকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে। এটা পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য এবং পুনরাবৃত্তি সাপেক্ষ। অধ্যাপক ডাঃ এস. ভি. রাও একজন বিখ্যাত শারীর বিজ্ঞানী ও যোগ শিক্ষক। তিনি বলেছেন যে, যোগ শুধুমাত্র একটি যুক্তিগ্রাহ্য সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞানই নয়, সর্বপরি এটি সমস্ত শরীরধারী জীবের জন্য এক বিশেষ কলাও বটে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন আমরা দেখি, রোগের কারণতত্ত্ব, বিকারতত্ত্ব, নির্ণয়তত্ত্ব এবং সর্বশেষে নিদানতত্ত্ব---ঠিক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী যোগেও সেই রকম বিভিন্ন তত্ত্ব আছে যা আধুনিক বিজ্ঞনের সঙ্গে মিল খায়।

রোগের নিবারণ তত্ত্ব ঃ

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অল্প কিছুদিন আগে থেকে আমরা রোগ নিবারণ তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিতে শিখেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যৌগিক পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের জন্য যম ও নিয়মের বিধান বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল যা আজকের দিনের ভয়াবহ মহামারী রোগগুলিকে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে পেরেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উচ্চ রক্তচাপ ও মধুমেহ রোগ দুটির কথা। যোগে বলা হয়েছে, 'প্রতিপক্ষ ভাবনম্'(বিপরীত দিক থেকে ভাবা), 'সমৎভাব'(সকলের প্রতি সমান ভাবা) এবং 'বৈরাগ্য'(নির্লিপ্ততা বা অনাসক্ততা)—যা আধুনিক যুগের বহু মনঃদৈহিক বিশৃঙ্খলাকে নিরোধ করতে সমর্থ হয়েছে। অতি সাধারণ ভাবে দেখতে পায় শুদ্ধতা বা শৌচতার কথা বারবার বলা হয়েছে যৌগিক পদ্ধতিগুলিতে যা বহু সংক্রামক রোগগুলিকে সহজেই প্রতিহত করতে পারে বা পেরেছিল পুরাকালে। তাই বোধহয় এইডস বা হেপাটাইটিস রোগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়নি বৈদিক কালে। শুধুমাত্র সংক্রামক রোগই নয় আধুনিক যুগের বহু ক্ষয়কারক রোগকেও প্রতিহত করা যায় যদি যৌগিক পদ্ধতিতে সঠিক ভাবে উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে নিয়মিত, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান অভ্যাস করা যায়। পদ্মভূষণ প্রাপ্ত প্রখ্যাত নিউরোসার্জন, ডাঃ রামমূর্তির কথায়, 'আধুনিক যুগের মানুষের মধ্যে যে আগ্রাসী ও হিংসাপ্রবণ মনোভাবের উদয় হয়েছে তাতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের কথা স্মরণ করে, প্রাচীন বৈদিক যোগের সাহায্য নিতে হবে। যোগ কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ হচ্ছে অনাদিকাল থেকেই প্রচলিত সমগ্র বিশ্বের মনুষ্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণী জগতের জন্য প্রযোজ্য শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস সাপেক্ষ বিশেষ এক নিদান'। তিনি আরও বলেন যে, আধুনিক জগতে যোগ হচ্ছে বিশ্বের জীবজগতের জন্য প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের দ্বারা প্রদত্ত এক অনবদ্য অবদান। যোগের নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থিতন্ত্র, মনোবিজ্ঞান এবং রোগনিরোধক ইম্যুনোলজির সমন্বয় ও বিকাশের সাহায্যে মহামারী ও দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে নির্মূল করা যেতে পারে। কেননা শরীরের সমস্ত তন্ত্রগুলিই অর্থাৎ হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, পাচকতন্ত্র, স্নায়ু ও গ্রন্থিতন্ত্র একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত। তাই একমাত্র যোগ বা যৌগিক পদ্ধতির দ্বারাই সমস্ত তন্ত্রকে একসূত্রে বাঁধা যায়।

কিছু উল্লেখনীয় রোগের কথা ঃ

আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে যোগবিজ্ঞানের কোথাও বিরোধ নেই। প্রাচীনকালে অর্থাৎ চরক বা সুশ্রুতের সময়ে বিভিন্ন প্রকার ভেষজ ঔষধির প্রয়োগ এবং শল্য চিকিৎসার প্রচলনও ছিল। হরিদ্বারের পতঞ্জলি যোগপীঠের আচার্য বালকৃষ্ণের প্রণীত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে নাকি দশ সহস্রেরও বেশি ভেষজ ঔষধির প্রচলন ছিল। সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে, পাঁচ শতাধিকেরও বেশি অস্ত্রচিকিৎসা, এনেস্থেসিয়া, অস্থি-চিকিৎসা ও সম্মোহন

পাত্রী চাই

পাত্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র,
34/5'7", B.Sc(H),
সরকারি চাকুরে।
আসানসোল।
ঘরোয়া পাত্রী চাই।
—যোগাযোগ—
০৩৪১২৩১২৪৭৬ /
৬২৯০০০৯৩৪১

বিদ্যার কথা। এমনকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছানি কাটার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের রয়েল কলেজ অব সার্জেনের অফিসে এই পৃথিবীর আদি শল্য চিকিৎসক সুশ্রুতের প্রতিমূর্তি রাখা হয়েছে যা প্রতিটি ভারতীয়েরই গর্বের বিষয়।

যাইহোক, প্রাচীনকালে এমন নয় যে শুধুমাত্র আসন ও প্রাণায়াম দ্বারাই সমস্ত রোগের নিরাময় করা হতো। তাই আজ যদি কেউ মনে করে যে, 'হার্ট অ্যাট্যাক' বা 'হেড ইনজুরি' শুধুমাত্র যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যেই ঠিক হয়ে যাবে তবে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। প্রখ্যাত যোগগুরু ডাঃ স্টিফেন ব্রেনারের কথায়, যোগের সাহায্যে অবশ্যই উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, ক্ষুধামান্দ্য, শ্বাসকষ্ট, নিদ্রাহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিষণ্ণতা, দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি, যকৃত বা বৃক্কের বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি, অ্যাজমা, সন্ধিরোগ, মৃগীরোগ, চর্মরোগ—ইত্যাদি বহু রোগের চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু 'আপদকালীন' বা 'জরুরী' রোগের জন্য আধুনিক চিকিৎসালয়ের আশ্রয় নিতেই হয়। যোগবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে আপাত কোনো বিরোধ নেই বরং একে অপরের পরিপূরক রূপে কাজ করতে পারে। আপৎকালীন অবস্থার নিরাময়ের পর রোগীর অনুবর্তী অবস্থার চিকিৎসা যোগের দ্বারা করা সম্ভব। সব সময় মনে রাখতে হবে রোগের নিরাময় এবং রোগীর স্বাস্থ্যই হলো মূল কথা। কোন পদ্ধতিতে তা করা হয়েছে সেটা অবশ্যই গৌণ বিষয়। একে বলা হয় সর্বাঙ্গীণ বা 'হোলিস্টিক' পদ্ধতি। মহামতি প্লেটোর কথায়, 'কোনো একটি বিশেষ অঙ্গের চিকিৎসা নয়, বরং একই সাথে সমগ্র শরীরের নিরাময় করতে হবে'।

পুনর্বাসন পদ্ধতি ঃ

যোগের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে বিকলাঙ্গ ব্যাক্তিদের নিরাময় সম্ভব। নিয়মিত যৌগিক আসন পদ্ধতিগুলি অভ্যাস করলে পক্ষাঘাতের রোগী এবং বিশেষ করে গেঁটেবাতের রোগীরা পুনরায় তাদের শারীরিক ক্ষমতা ফিরে পায়। পথ দুর্ঘটনাগ্রস্ত



স্বামীজী ডাঃ গীতানন্দ গিরির কথা, 'আমি আধুনিক চিকিৎসার দ্বারা প্রাণ ফিরে পেয়েছি বটে কিন্তু আমার দীর্ঘ ছয় মাস 'প্লাস্টার কাস্টের' জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে যৌগিক আসন ও প্রাণায়াম। হাঁটাচলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে ঠিক যেন পুনর্জীবন লাভ করেছি'। এছাড়াও দেখা গেছে যারা নেশাগ্রস্ত, মাদকাসক্ত ও নানা প্রকার অসামাজিক কাজে যারা লিপ্ত তারাও যোগের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। পতঞ্জলি যোগপীঠের স্বামী রামদেব বাবার কথায়, 'আমরা জেলখানার কুখ্যাত অপরাধীদেরকেও আমাদের যোগের কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জীবনে পুনর্বাসন করার প্রকল্পগুলি পরিচালনা করি। তাছাড়া যে সব যুবক-যুবতী নানা কারণে সমাজচ্যুত হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকেও যৌগিক পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আমরা সফল হয়েছি'। যোগের সাহায্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছা শক্তির ক্ষমতা আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়ে। যোগের সাহায্যে মনের ঋণাত্মক ভাবনাগুলি থেকে অচিরেই মুক্তি পাওয়া যায় এবং জীবন গঠনকারী শক্তিগুলির স্ফূরণ হয়।

খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ ঃ

যৌগিক চিন্তাগুলি অবিশ্বাসনীয় রূপে মানুষের খাদ্যাখাদ্যের প্রকৃতিগুলি নির্ণয় করে। কথায় আছে, 'যেমনি অন্, তেমনি মন'। এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই নির্ভর করে ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজ ও তম) উপর। যৌগিক শাস্ত্রেও বলা হয়েছে ত্রিদোষের কথা। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার খাদ্যের (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) কথা আমরা জানতে পারি গীতার ষোড়শ অধ্যায় থেকে। প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রকৃতি বায়ু, কফ ও পিত্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেই অনুসারে তার খাদ্যও নির্দেশিত হয়ে আছে। তাই সঠিক খাদ্য ও পানীয়, উপযুক্ত সময়ে এবং পরিমাণ মতো খেলে নানা প্রকার ব্যাধি থেকে সহজেই মুক্তি লাভ করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানও সেকথা স্বীকার করে। তাই দেখি পশ্চিমি দেশগুলিতেও নিরামিষ ভোজনের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশই যেন বাড়ছে। যৌগিক শস্ত্রে বলা হয়েছে, অজীর্ণ, অতিজীর্ণ এবং কুজীর্ণ-তত্ত্বের কথা এবং খাদ্যাদির গুণাবলী বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অতিভোজী অথবা নিরাহারীর পক্ষে যোগী হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। তাই তিনি অর্জুনকে মিতাহারী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

শরীর ও মনের শিথিলীকরণ পদ্ধতি এবং মানসিক বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধ ঃ

আধুনিক মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত লেগেই আছে শারীরিক ও মানসিক সংঘাত। তাই যৌগিক পদ্ধতির মাধ্যমেই আছে এর সমাধান। যোগ শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের আসন ও প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। যেমন শবাসন, অনুলোম-বিলোম প্রক্রিয়া, সাবিত্রী ও চন্দ্র প্রাণায়ম, কায়া ও মর্মাস্থানাম ক্রিয়া, বিপাশনা ও যোগনিদ্রা। শুনলে অবাক হবেন আবার গর্ববোধও করবেন, আমেরিকার মতো দেশের প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানীরা ভারতীয় যোগের উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানের আলোয় যোগকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শরীর, মন ও আত্মার সম্বন্ধ গভীর যা ভৌতিক গবেষণাগারের পরীক্ষার অতীত। কথায় আছে, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'? যৌগিক শিক্ষা দিয়ে মনকে

প্রস্তুত করা হয় যাতে সহজেই সংঘাতপূর্ণ সমস্যাগুলির সহজ সমাধান করা যায়। এ জগতে মৃত্যুভয় হচ্ছে মহাভয়। তাকে জয় করাই হচ্ছে 'মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র' যা পাওয়া যায় যোগের শিক্ষার মধ্যে। যোগাচার্য স্বামী গীতানন্দের কথায়, মৃত্যুর মুহূর্তটির জন্য জীবনকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে যৌগিক শিক্ষা। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যৌগিক শিক্ষার দ্বারা মস্তিষ্কে কৃত্রিম উপায়ে এন্ডরফিন, সেরোটনিন, এপিনেফ্রিন ইত্যাদি স্নায়ুকোষের সিগনালিং মৌলগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করানো যায়। গত বছরে প্রকাশিত স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রখ্যাত সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে এক যুগান্তকারী পরীক্ষার কথা। মাত্র ছয় মাস, ২১ জন সাধারণ ব্যাক্তির সাথে ২১ জন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের শুক্লযজুর্বেদের শ্লোক উচ্চারণ প্রতিযোগিতায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অঞ্চলে অর্থাৎ 'অ্যামিগডেলা ও হিপোক্যাম্পাসে'র স্নায়ুকোষগুলির উদ্দীপনা ও সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে শেষোক্ত দলে অনেক বেশি পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যা কিনা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভাষাতেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যোগে 'কিউর' হয় না সাময়িক উপশম হয় মাত্র। কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। বরং উল্টোটাই সত্য। জড় থেকে নির্মূল করতে হলে যোগই হচ্ছে একমাত্র উপায়। ক্যানসার রোগীদের সব সময় হয়তো নির্মূল করা সম্ভব নয় কিন্তু বেদনা নাশক, 'মরফিনের' মাত্রা যথেষ্ট কম করতে দেখা গেছে যোগের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রকার দুরারোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিগুলি যেমন 'রিউমাটোএয়েড আর্থাইটিস' বা 'মাল্টিপল স্কেলরোসিস' নিরাময় না হলেও যোগের সাহায্যে অনেক উপশম করা যায়। যোগের দ্বারা অন্তশক্তির বিকাশও বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে করে সহ্য শক্তিকে বাড়ান হয়। ভারত ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে যোগ প্রণালীর দ্বারা সহ্য ক্ষমতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে করে আর্থিক ও শারীরিক লাভ হয় অনেক বেশি। আধুনিক চিকিৎসাতে অনেক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দল ও নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি ওষুধের প্রয়োগে ব্যাধিগুলির উপাচার করা হয় কিন্তু যোগের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র নিজের ইচ্ছা শক্তির নিরন্তর অনুশীলনের সাহায্যেই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়।

বার্ধক্য ও যোগবিজ্ঞান ঃ

যোগের সাহায্যে বয়সকে থামিয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু বার্ধক্যজনিত রোগকে প্রতিহত করা যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীরের ক্ষয় শুরু হয়। তাতে করে মস্তিষ্কের রোগ যেমন এলজাইমার বা পার্কিনন্স ডিসিজের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিকে প্রতিহত করার শক্তি যোগে আছে। এ যুগের বিশ্ববিখ্যাত যোগী পদ্মভূষণ বি. কে. এস. আয়েঙ্গারের নাকি ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল নিরানব্বই বছর বয়সে। শুধু মস্তিষ্কই নয়, হৃদরোগ, অস্থি সম্বন্ধীয় হাঁটু বা হিপ জয়েন্টের রোগ এবং ফুসফুসের রোগগুলি থেকে বহুল পরিমাণে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সম্প্রতি বি.এম.জেতে প্রকাশিত হয়েছে আগামী বছর (২০১৮–২০১৯) ইংল্যান্ডে ১৭০০ 'হিপ এবং নি' জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি রদ করা হয়েছে। কেন এমনটা হয় আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মতো আধুনিক সভ্যতায় বলীয়ান পাশ্চাত্য দেশগুলিতে? এর উত্তর হচ্ছে, অত্যধিক মাত্রায় 'পঞ্চম ম'কারের অসদ্ব্যবহার। যোগের সাহায্যে জীবনশৈলীর পরিবর্তনের মাধ্যমে, আহার-বিহারে সংযম আনলে, দৈনিক যোগাসন, নানা ক্রিয়া ও মুদ্রা, বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়াম এবং যৌগিক দর্শণশাস্ত্রগুলির যথাযথ অনুশীলন করলে অবশ্যই বার্ধক্যজনিত রোগগুলির যথেষ্ট পরিমাণে উপশম করা যেতে পারে। জন্ম-মৃত্যুর মতো বার্ধক্যও হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী। তাকে রোধ করা যায় না কিন্তু তাকে স্বাভাবিক ছন্দে ও লয়ে বরণ করে নেওয়ার কৌশল যোগশিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। আমরা জানি শতরঞ্জ বা দাবা খেলাটা বিশ্বের দরবারে ভারতীয়রাই প্রথম এনেছিল। বৈদিক সাহিত্যে এমনকী মহাভারতেও এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এখনও দেখা যায় গ্রামের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা 'ব্রিজ' খেলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশ্ববিখ্যাত দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কথা কে না জানে? এতে করে সমস্ত মস্তিষ্কের তিন ট্রিলিয়ন কোষগুলির নিয়মিত ব্যায়াম হয় যা তাকে সজীব থাকতে সাহায্য করে। বার্ধক্যেও নিয়ে আসে তরুণ মস্তিষ্কের অনুপ্রেরণা। এটা সম্ভব শুধু যোগের অনুশীলন থেকে। আমেরিকার বিখ্যাত গবেষক ও চিকিৎসক ডাঃ ডিন অরনিস বলেছেন, 'যোগের সাহায্যে এমনকী রোগগ্রস্ত হৃদযন্ত্রকেও তার স্বাভাবিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যোগের দ্বারা জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন যেমন সম্ভব তেমনিই সম্ভব শারীরিক ব্যাধিগুলির উপাচার ও নিরাময়'।

উপসংহার ঃ

প্রখ্যাত যোগগুরু গীতানন্দজী মহারাজের কথায়, 'স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে সকলেরই জন্মসিদ্ধ অধিকার আছে। পাশ্চাত্যের জাঁকজমকপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী ও সহজলভ্য সুখের পিছনে না ছুটে বেড়িয়ে আমাদের উচিৎ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় যোগশিক্ষাকে গ্রহণ করা, গবেষণা করা এবং বিশ্ব কল্যাণে তার প্রচার ও প্রসার করা'। 'এনেস্থেসিয়ার' প্রয়োগ এসেছে মাত্র ১৭৫ বছর আগে আর আধুনিক শল্য-চিকিৎসা এসেছে তারও অনেক পরে কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকেই যোগের প্রয়োগের কথা আমাদের বৈদিকশাস্ত্র গুলিতে দেখা যায়। মহাজাগতিক চৈতন্যর অবধারণার সাথে সাথেই ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখ সম্মিলিত শারীরিক রোগব্যাধিগুলির উপাচার ও নিরাময়ের নিদানও পরমাত্মা সৃষ্টির শুরুতেই আমাদের দিয়েছিলেন ধন্বন্তরি, পতঞ্জলি, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অসংখ্য মুনিঋষিদের মাধ্যমে একাজে মহতী ভূমিকা পালন করে চলেছে। হরিদ্বারে বাবা রামদেবের নেতৃত্বে পতঞ্জলি যোগপীঠ একাজে মহতি ভূমিকা পালন করে চলেছে। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ যোগাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণজীর নিরন্তর প্রয়াসে সারা বিশ্বে প্রাচীন ভারতীয় যোগের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ২১শে জুন সারা পৃথিবী জুড়ে 'বিশ্ব যোগদিবস' হিসাবে পালন করা হচ্ছে। এর জন্য আমরা প্রতিটি ভারতবাসীই গর্বিত।■



নতুন বউ

সিদ্ধার্থ সিংহ

পা টিপে টিপে দেবায়ুধ ঘরে ঢুকলেও কী করে যেন টের পেয়ে গেল তানিয়া। পাশের রান্নাঘর থেকে গলা তুলে বলল, আবার ওখানে গিয়েছিলে?

—আবার? কোথায়?

—একদম মিথ্যে কথা বলবে না। তুমি ভেবেছ, আমি কিছু দেখিনি, না?

—তোমার এত সন্দেহবাতিক না.... কী বলব।

—সন্দেহবাতিক? গজগজ করতে করতে ওভেনের আঁচ কমিয়ে দুদ্দার করে এ ঘরে ঢুকেই তানিয়া বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—এতক্ষণ!

—একদম বাজে কথা বলবে না। একটু আগেই আমি উঁকি মেরে দেখে গেছি। তুমি ঘরে ছিলে না। শুধু মায়ের জন্য চা বসানো ছিল বলে.... না হলে একেবারে হাতেনাতে ধরতাম।

—আরে বাবা, একটু বাথরুমেও যেতে পারব না!

ওদের বাড়ির বাথরুমটা একটু দূরেই। ওর দাদু যখন ওপার বাংলা থেকে ঢাকুরিয়ায় এসে বাড়ি করেন, তখন ঢাকুরিয়ার চেহারা এ রকম ছিল না। একেবারেই যেন একটা গঞ্জ। ক'হাত দূরে দূরেই ছিল পুকুর আর খোলা মাঠ। এ দিকে ও দিকে বাগান। মাঝে মাঝেই দু'-তিন তলা বাড়ি মাথা তুললেও বেশিরভাগই ছিল টালি আর টিনের ছাউনি দেওয়া একতলা বাড়ি। হাওড়া থেকে একটাই বাস ছিল। পাঁচ নম্বর। তখনও ঢাকুরিয়া ব্রিজ হয়নি। গাড়িঘোড়াও এত কম ছিল যে, রেল ক্রসিংয়ে প্রায় সারাক্ষণই গেট পড়ে থাকত। এখন যেখানে দক্ষিণাপণ, মধুসূদন মঞ্চ হয়েছে, সেটা ছিল একটা বিশাল পানাপুকুর। তারই এক পাশে ভাগাড়। কুকুর, বেড়াল বা গরু মারা গেলে ওখানেই ফেলা হত। চিল শকুন উড়ে বেড়াত।

দাদুর আমলে ওপার বাংলার লোকেরা যতই ধনে মানে বড় হোক না কেন, সকালের কাজ সারতে সবাই নাকি মাঠেঘাটেই যেত। বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে বাথরুম বানানোর কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। তাই এপার বাংলায় এসে বেশ খানিকটা জায়গা কিনে বাড়ি করার সময়ও দেবায়ুধের দাদু বাথরুম তৈরির কথা একবারও ভাবেননি। ফলে বাড়ির কাজ যখন একেবারে শেষের দিকে, তখন আশপাশের লোকেরা দেখলেন, উনি বাড়ি বানাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে কোনও বাথরুম বানাচ্ছেন না; তখন তাঁরাই তাঁকে বারবার করে বোঝালেন। ফলে, তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী শেষ মুহূর্তে বাড়ির পিছন দিকে সবজির বাগান করার জন্য উনি যে জায়গাটা ছেড়ে রেখেছিলেন, সেটার শেষ প্রান্তে দরমা দিয়ে একটা বাথরুম বানিয়ে নিয়েছিলেন। দরজার কোনও বালাই ছিল না সেখানে। উনি বলেছিলেন, দরজা দিয়ে কী হবে? গেলে তো ঘরের লোকই যাবে। বাইরের লোকেরা তো আর যাবে না। ফালতু ফালতু.... তবু লোকজন বারবার করে বলায় দরজার জায়গায় উনি ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন চটের একটা বস্তা।

পরে, অবশ্য দরজা লাগানো হয়। তারও পরে, তাঁর ছেলেরা সেটা পাকা করেন। তারও বহু পরে, পরিবারের

শাখাপ্রশাখা যখন আরও ছড়িয়েছে, তখন নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে তার পাশে আরও দু'দুটো বাথরুম বানিয়ে নিয়েছিলেন দেবায়ুধের বাবা এবং তার একমাত্র কাকা। টিনের চালের জায়গায় যেমন লাগিয়ে নিয়েছিলেন অ্যাসবেস্টস। তেমনি খাওয়ার জলের জন্য পাতকুয়োর পাশাপাশি বসিয়ে নিয়েছিলেন ডিপ টিউবওয়েলও।

এর মধ্যে প্রচুর সময় গড়িয়ে গেছে। দেবায়ুধের দাদুও গত হয়েছেন। দু'ভাইয়ের হাঁড়িও আলাদা হয়েছে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বাড়িটা আর ভাগ হয়নি। বাড়ির পিছন দিকটায় যেমন দেবায়ুধের কাকারা থাকেন তেমনি সামনের দিকটায় থাকে দেবায়ুধেরা।

বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই ওদের ঘর। তার ডান পাশে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশে মা বাবার ঘর। তখন চার দিকেই খোলামেলা ছিল। ফলে বর্ষাকালে সাপ ব্যাং ঘরে ঢুকে যেত। ঝড় উঠলে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ত ঝঞ্ঝা। সিঁধেল চোরের উপদ্রপও কম ছিল না। তাই ওর দাদুই এই ঘরগুলির সামনে পুরনো ইট দিয়ে প্রায় এক মানুষ সমান টানা পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন। সে পাঁচিল জরাজীর্ণ হয়ে এখনও দাড়িয়ে আছে।

পাঁচিলের ওপাশে থাকেন কাকারা। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে, কাকাদের ঘরের সামনে দিয়ে, বাগানের দিকে চলে গেছে সরু একটা পথ। সেই পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই ডান দিকে আর বাঁ দিকে মুখোমুখি দুটো ঘর।

বাড়ির ট্যাক্স জমা দেওয়া নিয়ে ছেলেদের মধ্যে যাতে কোনও দিন কোনও মুখ কালাকালি না হয়, সে জন্য দেবায়ুধের দাদুই তাঁর জীবদ্দশাতেই বাড়ির পিছন দিকে আলাদা করে এই দুটো ঘর তুলে ভাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য সেই ভাড়াটেরা আর নেই। বাড়ি করে সুভাষগ্রামে চলে গেছেন। তার জায়গায় এসেছে নতুন দুটো ভাড়াটে।

তাদের একজনের এক ছেলে। কিছু দিন আগে বিয়ে করেছে। একেবারে ফুটফুটে বউ। কিন্তু বিয়ের পর এক মাস কাটতে না কাটতেই অফিস থেকে তাকে বদলি করে দিয়েছে শান্তিনিকেতনে। প্রথম প্রথম ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত। ভোরবেলায় বেরিয়ে অনেক রাতে ফিরত। কিন্তু অত ধকল বেশি দিন শরীরে সইল না। ফলে ওখানেই এক সহকর্মীর বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতে শুরু করল। এখনও সেখানে সেভাবে কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে না পাড়ায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছেই বউকে রেখে গেছে। শুক্রবার রাতে এসে সোমবার ভোর থাকতে উঠে রওনা হয়ে যায়।

ওই ঘরেরই মুখোমুখি থাকেন এক বৃদ্ধা। তাকে ওরা ভাড়াটে মাসি বলে ডাকে। বেশ কয়েক বছর ভুগে তাঁর স্বামী তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছেন। স্বামীর পেনশনের সামান্য ক'টা টাকায় তাঁর সংসার কোনও রকমে চলে যায়। সংসার বলতে সে আর তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটি দেখতে শুনতেও যথেষ্ট ভাল। কিন্তু মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে গেলে তো কিছু টাকা পয়সাও দরকার। সেটা কিছুতেই জোগাড় করে উঠতে পারছেন না বলে সে পথে তিনি পা-ও বাড়াতে পারছেন না।

সে যাই হোক, এই দুই ভাড়াটিয়ার সঙ্গেই দেবায়ুধের খুব ভাল সম্পর্ক। যখন তখন মাসিমা মাসিমা করে ওদের ঘরে যায়। ওরাও হুটহাট আসে। বিশেষ করে এই ভাড়াটে মাসির মেয়েটি আর ওই ভাড়াটিয়ার নতুন বউটি।

এই ভাড়াটেরা যখন আসে তখন অত নিয়মকানুনের কেউ কোনও ধার ধারত না। ফলে ভাড়া দেওয়ার সময় কোনও এগ্রিমেন্ট ফেগ্রিমেন্টও হয়নি। তাই একই ভাড়ায় বছরের পর বছর ধরে ওরা থাকছে। তাদের টাকায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া বাড়ির ট্যাক্সের পুরো টাকা না উঠলেও, যা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাকি টাকাটা দেবায়ুধের বাবা আর কাকা মিলে ভাগ করে দেন। ঘরের লাগোয়া ফাঁকা জায়গায় দু'জনেই যে যার দরকার মতো একটা দুটো করে ঘর তুলে নিয়েছেন। 'তুই কেন দুটো ঘর তুললি'—এই নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে কোনও দিন কোনও মনোমালিন্য হয়নি। কারণ, তার আগেই দেবায়ুধের বাবা একাই খরচাপাতি করে ঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত যাতায়াতের লম্বা পথটা পাকা করে দিয়েছিলেন।

কখনও বাবা, তো কখনও কাকা পালা করে মাঝে মাঝেই প্লাস্টার চুনকাম করে চেহারা ফেরালেও বাথরুমটা কিন্তু সেই একই জায়গায় রয়ে গেছে। ঘর থেকে অনেক দূরে। ফলে বৃষ্টি বাদলার দিনে যাতায়াত করতে একটু অসুবিধে হয় বই কী।

তাই দেবায়ুধ যখন বলল, 'আরে বাবা, একটু বাথরুমেও যেতে পারব না!' তখন তানিয়া বলল, শোনো, আমি সব বুঝতে পারি। জেনে রাখো, তুমি যতই ডালে ডালে চলো না কেন, আমিও কিন্তু পাতায় পাতায় চলি। বুঝেছ? বলেই, রান্না করার জন্য পাশের ঘরে চলে গেল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবায়ুধ বলল, যাক বাবা, বাঁচা গেল। বউ তো নয়, যেন মিলিটারি। ও যখন রান্নাঘরে গেছে, তার মানে এক্ষুণি আর এ দিকে আসছে না। এই ফাঁকে আমি বরং... ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তড়িঘড়ি ভাড়াটিয়াদের ঘরের দিকে চলে গেল। দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই নতুন বউটি ভিতর ঘরের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল তার শ্বশুর শাশুড়ি দেখছে কি না, তার পর ঝপ করে দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে ইশারায় বলল, কী?

দেবায়ুধ কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বাঁ দিকে চোখ চলে গেল নতুন বউয়ের। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় সে বলল, তোমার বউ।

দেবায়ুধ ডান দিকে মুখ ঘুরিয়েই চমকে উঠল। দেখল, পাঁচিলের পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে তানিয়া দেখছে। এটা দেখে আর এক মুহূর্ত দাড়াল না ও। চটপট বাথরুমের দিকে চলে গেল।

দিন কতক আগে ভাড়াটে মাসির মেয়েটার সঙ্গে সে যখন প্রথম ওকে অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কথা বলতে দেখেছিল, তখনই মাথার মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল তানিয়ার। তার পরেই পাশের বাড়ির শুভ্রাদি এসে যখন তাকে বলল, স্বামীটাকে একটু চোখে চোখে রেখো। তখন ওর ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, কেন গো? কী হয়েছে?

শুভ্রাদি বলেছিল, কী হয়েছে মানে, রাস্তায় মাছের আঁশ ফেলতে গিয়ে দেখি, তোমার স্বামী ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমাদের বাড়ির নতুন বউটার সঙ্গে একেবারে গদগদ হয়ে কথা বলছে।

—হ্যাঁ। ও তো ওর সঙ্গে কথা বলেই....

—আরে বাবা, দেখলে বোঝা যায় না... কোনটা এমনি কথা আর কোনটা অমনি কথা?

—মানে?

—মানে আবার কী? কিছু বোঝো না? সদ্য বিয়ে হয়েছে। স্বামী সপ্তাহে এক দু'রাত থাকে। তাতে পোষায়?

ঠোঁট টিপে শুভ্রাদি এমন ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসেছিল যে, তানিয়ার সারা শরীর রাগে রি রি করে উঠেছিল। সেই শুরু।

ওর এই একটাই দোষ। লোকের কথায় খুব নাচে। যে যা বোঝায় সেটা নিয়ে লাফালাফি করে। তার পরেই আবার যখন খানিকক্ষণ একা থাকে, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, তখন আবার সব কিছু তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে। তখন তার হৃদয় একেবারে সমুদ্রের মতো আদিগন্ত হয়ে ওঠে। তবে তখনও তাতে বড় বড় ঢেউ কিন্তু খুব একটা কম থাকে না। আর সেই ঢেউয়ের সামনে যে পড়ে, তাকেও বেশ ভালো রকমই নাকানিচোবানি খেতে হয়।

তা, শুভ্রাদি ওটা বলার পর থেকেই স্বামীকে যে চোখে চোখে রেখেছে। কিন্তু ঘর-সংসার সামলে সারাক্ষণ কি আর স্বামীকে ফলো করা যায়! তবু যতটা সম্ভব ও করে। আর যতই ফলো করে, ততই তার সন্দেহ চরচর করে বাড়তে থাকে। আর সন্দেহ যত বাড়ে, স্বামীর উপর রাগও বাড়ে। একা একাই রাগে গজগজ করে, অথচ হাতেনাতে ধরতে না পারলে ও তাকে কিছু বলতেও পারছে না। এটা যে কত বড় যন্ত্রণা! আর সহ্য করতে পারছে না ও। আর সেই যন্ত্রণা থেকেই তৈরি হয়েছে স্বামীর উপর এমন একটা ক্ষোভ যে, স্বামী যা করে তাতেই ও বাধা দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কোনও ভাল কাজ করছে বুঝতে পারলেও তার মধ্যে থেকে ও ঠিক খুঁত খুঁজে বার করে।

বাজার থেকে দেবায়ুধ কোনও দিন চুনোমাছ নিয়ে এলে যেমন সে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—আনার আর দিনক্ষণ পায় না! নিয়ে এলেই হলো। এগুলি এখন সারা দিন ধরে কে কাটবে শুনি? তেমনি কাটাপোনা নিয়ে এলেও বলতে ছাড়ে না—বাজারে কি আর কোনও মাছ নেই? রোজই সেই একই কাটাপোনা? কাটাপোনা খেতে খেতে যে মুখ একদম পচে গেল।

বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে আসার পর থেকে অফিস যাওয়ার সময় দেবায়ুধের জামাপ্যান্ট ওই বের করে দিত। এখন ওর উপর রেগে থাকায় সেটাও করে না। দেবায়ুধ নিজেই নিজের মতো করে জামাপ্যান্ট বার করে নেয়। আর যাই পরুক না কেন, সেটা নিয়েও টন্ট করতে ছাড়ে না সে। অনেক সময় মুখ ফসকে বলেও ফেলে—ভেবেছ, ডুবে ডুবে জল খাবে কেউ টের পাবে না, না? যত বয়স বাড়ছে, ততই সাজপোশাক বাড়ছে। ভেবেছ, আমি কিছু বুঝি না, না?

তানিয়া আগে এ রকম ছিল না। দেবায়ুধ লক্ষ্য করে দেখেছে, তানিয়া দিন দিন কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। ও যাই করতে যায়, তাতেই ওর আপত্তি। তাতেই ওর বাগড়া দেওয়া চাই। এই তো সে দিন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার মুখে একটা বেড়ালছানা ম্যাও ম্যাও করে ওর পায়ের কাছে এসে ঘুরঘুর করছিল। একেবারে এইটুকুনি বেড়াল। এ রকম মানুষ ঘেষা যখন, তখন নিশ্চয়ই কারও পোষা। কিন্তু কার এটা।

হয়তো খিদে পেয়েছে, তাই এ রকম করছে। এটা ভেবে, 'তু তু' করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সে। তানিয়াও কুকুর বেড়াল ভালবাসে। গাছ ভালবাসে। বাগানে এখনও যে দু' চারটে ফল ফুলের গাছ টিকে আছে, তা ওরই দেখভালের জন্য। কিন্তু বেড়ালটাকে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে দেখেই ও একেবারে রে রে করে উঠল।—এক্ষুণি বার করো এটাকে।

শুধু বেড়াল নয়, মাছ নয়, জামাপ্যান্টও নয়, দেবায়ুধের সব কিছুতেই বাধ সাধাটা তানিয়ার যেন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই দেবায়ুধ যা করে, তা ওর বউয়ের চোখের আড়ালেই করে। তবু মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়লেই যত বিপত্তি।

না। মুখে সে ভাবে সে কিছু বলে না ঠিকই, কিন্তু ওর আচার আচরণে তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। দরাম করে দরজা বন্ধ করে। ধপড়ধপড় করে হাঁটে। আছড়ায় দাপড়ায়। কোনও কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। রাতে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে।

তাই বাথরুম থেকে সোজা রান্নাঘরে

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

ঢুকেই মিন মিন করে দেবায়ুধ জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে?

তানিয়া কোনও উত্তর দিল না।

—আমাকে খুঁজছিলে?

এ বারও কোনও উত্তর নেই।

—কী হল, শুনতে পাচ্ছ না?

—ক'বার বাথরুমে যাও?

ব্যস। এই একটি বাক্যেই দেবায়ুধ একদম বোল্ড আউট হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগেই না সে ওর বউকে বলেছিল, 'আরে বাবা, একটু বাথরুমেও যেতে পারব না!' তা হলে এখন উপায়। দেবায়ুধ যখন জুতসই একটা উত্তর দেওয়ার জন্য কথার ঝুড়ি হাতরাচ্ছে, ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে হনহন করে পাশের ঘরে চলে গেল তানিয়া।

ওর এই হাঁটা দেবায়ুধের চেনা। বুঝতে পারল, প্রচণ্ড চটে গেছে ও। এখন মান ভাঙাতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই নব ঘুরিয়ে ওভেনের আঁচ নিভিয়ে সেও পাশের ঘরে গেল। ঘরে ঢুকেই দেখল, তানিয়া একটা বালতি ব্যাগের মধ্যে ওর শাড়ি ব্লাউজ ঠেসেঠুসে ভরছে।

ওটা দেখে হাত কামড়াতে লগল ও। ইশ্, কেন যে ওভেনটা নেভাতে গিয়ে সময়টা নষ্ট করলাম। কেন যে সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছু পিছু এলাম না! হায় রে! এখন আর কোনও উপায় নেই। এর আগেও এ রকম বহু বার হয়েছে।

পান থেকে চুন খসলেই ও ওর মায়ের কাছে চলে যায়। অনেক বার কোনও রকমে ওকে আটকেছে ঠিকই, কিন্তু সে দেখেছে, ও যদি একবার ওই বালতি ব্যাগে কিছু ভরে ফেলে, তা হলে কার বাপের সাধ্যি আছে ওকে আটকায়। সে বুঝতে পারল, হাজার অনুরোধ উপরোধ করলেও এখন আর চিঁড়ে ভিজবে না।

তবে এটাও ঠিক। ও যাচ্ছে বটে, তবে রাগ পড়তেও বেশিক্ষণ লাগবে না। হয় বিকেলেই ফিরে আসবে, নয়তো কাল সকালে। আর খুব যদি বেশি দেরি করে তো—কাল দুপুরে।

না। ওকে এখন ঘাঁটানো যাবে না। তা হলেই কথায় কথা বাড়বে। তার থেকে চুপচাপ থাকাই ভাল। তাই কোনও কথা না বলে খাটের এক পাশে গিয়ে জবুথবু হয়ে বইল দেবায়ুধ। বউ যখন ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ও বলল, কখন ফিরবে?

—জানি না। রান্না করা আছে। খেয়ে নিয়ো।

—রিকশা ডেকে দেব?

—না। বলেই, লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তানিয়া। বেরোবার সময় মেন গেট টেনে দরাম করে বন্ধ করে দিল।

দেবায়ুধের মা থাকেন রান্নাঘরের পাশেই পুরনো ঘরে। বাতের ব্যথার জন্য খাট থেকে সচরাচর নামেন না। কিন্তু মা যদি তার বউমার খোঁজ করেন, তা হলে মাকে সে কী বলবে, মনে মনে তাই সাজাতে লাগল সে। তার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ দিকে ও দিকে তাকিয়ে দেখল, না। তানিয়া কোথাও নেই। তার মানে বেরিয়েই ও রিকশা পেয়ে গেছে।

দেবায়ুধ বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে গেল ভাড়াটেদের দিকে। তার পর ঝট করে ঢুকে পড়ল নতুন বউয়ের ঘরে।

দশ মিনিট কাটল। পনেরো মিনিট কাটল। কুড়ি মিনিট কাটল।

—যা ভেবেছি, তাই। চিৎকার শুনে দরজার দিকে তাকাতেই দেবায়ুধ দেখল, তার বউ বালতি ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে একেবারে ফুঁসছে।

তড়াক করে লাফ মেরে উঠে আমতা আমতা করে দেবায়ুধ বলল, আমি কী করলাম।

—আবার জিজ্ঞেস করছ আমি কী করলাম? কিছু বুঝতে পারছ না? আমি সে দিনই সন্দেহ করেছিলাম। এখন দেখছি, যা ভেবেছি, তাই। যেই দেখেছ, আমি চলে গেছি, অমনি সাপের পাঁচ পা দেখেছ, না? সুড়সুড় করে এখানে চলে এসেছ?

আর তুমি? বলেই, নতুন বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে আমি এত বিশ্বাস করতাম। শেষ পর্যন্ত তুমিও?

—আমাকে দেবায়ুধদা বলতে বারণ করেছিল, তাই...

—তা বলে আমাকেও বলবে না? কোথায় ওটা?

পদ্মাসন হয়ে বসে ছিল নতুন বউ। তানিয়া জিজ্ঞেস করতেই আঁচল সরিয়ে কোলের ভিতর থেকে ছোট্ট বেড়ালছানাটাকে বার করে দেখাল সে।

দেবায়ুধ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না না, আমি না। আমি না। ও পোষে। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।

তানিয়া ট্রাফিক পুলিশের মতো 'থামতে বলার ভঙ্গিতে' হাত দেখিয়ে বলল, হয়েছে। অনেক হয়েছে। বলেই, নতুন বউকে বলল, দাও তো দেখি।

বিড়ালছানাটাকে তানিয়ার দিকে এগিয়ে দিতেই, তানিয়া তার হাতের বালতি ব্যাগটা ওদের দরজার কাছে নামিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ও মা কী কিউট গো...

—ভালো শাড়িটা পরে ওকে নিলে?

—বেশ করেছি। এটা তোমার দেওয়া না। গত বার বিবাহবার্ষিকীতে মা দিয়েছিল। ব্যাগটা নিয়ে এসো... আর এই যে নতুন বউ, দুধের বাটিটা কি ওখানেই পড়ে থাকবে, নাকি ওর জন্য নিয়ে আসবে? বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল তানিয়া। বালতি ব্যাগ নিয়ে ওর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল দেবায়ুধ। আর তার পিছনে পিছনে দুধের বাটি নিয়ে নতুন বউ।

ওরা যখন যাচ্ছে, নতুন বউয়ের উল্টো দিকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাড়াটে মাসির মেয়েটা শুধু বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম, বউদি ঠিক টের পেয়ে যাবে। কী? এখন আমার কথা ফলল তো? ■

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা

শকুনির চক্রান্তে কপট পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব দ্বৈতবনে কুটির বেঁধে বাস করছেন। তাঁদের বনবাস প্রায় শেষ হয়ে এল। এর পরে আবার এক বছর অজ্ঞাত বাস। সেই স্থানটি খুবই সুন্দর, শান্ত ও মনোরম। এখানে বসে তাঁরা পরামর্শ করছেন কোথায় অজ্ঞাতবাস



করা যায়। এমন সময় এক তপস্বী তাঁদের কাছে এলেন। পঞ্চপাণ্ডব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তপস্বী যুধিষ্ঠিরকে বললেন— রাজা, আমার অরণি একটি গাছে রেখেছিলাম। একটি হরিণ গাছের তলা যাবার সময় সেটি তার শিঙ্গে আটকে যায় এবং সেটি নিয়েই হরিণটি পালিয়ে যায়। আমার যজ্ঞ যাতে পণ্ড না হয়, তাই ওটি উদ্ধার করে দিন।

ব্রাহ্মণের যজ্ঞ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। তাই যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে তির-ধনুক নিয়ে হরিণের খোঁজে ছুটে গেলেন। কিন্তু কোথায় হরিণ? মাঝে মাঝে তার পাযের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু হরিণকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ভাবে চলতে চলতে তাঁরা পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়লেন ।

যুধিষ্ঠির নকুলকে বললেন— ভাই, সন্ধান করে জল নিয়ে এস। নকুল একটি বড়ো গাছে উঠে দেখলেন বহুদূরে একটি জলাশয় দেখা যাচ্ছে। নকুল জলাশয়ে পৌঁছে আঁজলা ভরে জল পান করতে উদ্যত, তখনই কে বলে উঠল, দাঁড়াও, এই জলাশয় আমার। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে জল পান কর। উত্তর না দিয়ে জল পান করলে মৃত্যু হবে। সেই কথা অগ্রাহ্য করে জল মুখে তুলতেই নকুলের মৃত্যু হলো। নকুলের ফিরতে বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠালেন। তাঁরও একই পরিণতি হলো। তার পর ভীম, অর্জুনও একে একে জল আনতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

জল আনতে গিয়ে ভাইয়েরা কেউ ফিরছে না দেখে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। তখন তিনি নিজেই জলাশয়ে উপস্থিত হলেন। মহাবীর চার ভাইকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ কেঁপে উঠল। তিনি ভাবলেন দুর্যোধনের চরেরা হয়তো জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষা করার জন্য তিনিও আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে দিতে যাবেন, তখন একই কথা। মহারাজ, এই জলাশয় আমার। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করলে আপনারও এই দশা হবে। যুধিষ্ঠির দেখলেন একটি বক কথা বলছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, কে আপনি? বক উত্তর দিল, আমি যক্ষ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যুধিষ্ঠির বিনীত ভাবে বললেন প্রশ্ন করুন।

যক্ষরূপী বক প্রশ্ন করতে লাগলেন আর যুধিষ্ঠির উত্তর দিতে লাগলেন।

প্রশ্ন : কিসের দ্বারা অমরত্ব লাভ হয়?

উত্তর : তপস্যার দ্বারা।

প্রশ্ন : কে জীবিত থাকতেও জীবিত নয়?

উত্তর : যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃলোকের নিমিত্ত দান করে না, তার জীবন থাকলেও তাকে জীবিত বলা যায় না।

প্রশ্ন : পৃথিবীর চেয়েও ভারী কে? আকাশের চেয়েও উঁচু কে? বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী কী? ঘাসের থেকেও সংখ্যায় বেশি কী?

উত্তর : মা পৃথিবীর চেয়েও ভারী। বাবা আকাশের চেয়েও উঁচু। মন বায়ুর চেয়ে দ্রুতগামী। ঘাস চিন্তার থেকেও সংখ্যায় বেশি।

প্রশ্ন : প্রবাসীর বন্ধু কে? গৃহীর মিত্র কে? রোগীর মিত্র কে? মরণাপন্ন ব্যক্তির মিত্র কে?

উত্তর : সঙ্গী প্রবাসীর বন্ধু। গৃহীর মিত্র স্ত্রী। রোগীর মিত্র চিকিৎসক। নিজ স্থানই মরণাপন্ন ব্যক্তির মিত্র।

প্রশ্ন : ধনের মধ্যে উত্তম কী? লাভের মধ্যে উত্তম কী? সুখের মধ্যে উত্তম কী?

উত্তর : ধনের মধ্যে শাস্ত্র। লাভের মধ্যে আরোগ্য। সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

প্রশ্ন : কী ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? কী ত্যাগ করলে শোক থাকে না? কী ত্যাগ করলে অর্থবান হয়? কী ত্যাগ করলে সুখী হয়?

উত্তর : অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়। ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক থাকে না। কামনা ত্যাগ করলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়।

প্রশ্ন : পুরুষের কোন শত্রু দুর্জয়? কোন ব্যাধির শেষ নেই? কোন লোক সাধু? আর কোন লোকই বা অসাধু?

উত্তর : ক্রোধ পুরুষের শত্রু। লোভের শেষ নেই। যে উপকার করে সে সাধু এবং যে নিষ্ঠুর সে অসাধু।

প্রশ্ন : সুখী কে? আশ্চর্য কী? পথ কী?

উত্তর : যিনি শাকান্ন ভোজন করেন, কিন্তু ঋণ করেন না, প্রবাসে থাকেন না, তিনি সুখী। প্রত্যহ লোক মরছে দেখেও মানুষ নিজের মৃত্যুর কথা ভাবে না, সেটাই আশ্চর্য। মহাজ্ঞানী ও সাধুপুরুষরা যে পথে যান, সেটাই পথ।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে খুশি হয়ে বললেন— আমি তোমার উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনার এক ভাই জীবন ফিরে পাবে। আপনি কোন ভাইকে চান? যুধিষ্ঠির নকুলকে চাইলেন। যক্ষ বললেন, আপনার মহাবীর দুই ভাই ভীম-অর্জুনকে না চেয়ে নকুলকে কেন চাইলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার মা। জননী কুন্তীর সন্তানদের মধ্যে আমি বেঁচে আছি। নকুল জীবিত হলে মাতা মাদ্রীরও একটি সন্তান জীবিত থাকবে।

যক্ষ এবার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন— যুধিষ্ঠির, আমি ধর্ম। আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। আপনি যথার্থই ধার্মিক ও জ্ঞানী। আমিই হরিণ রূপে তপস্বীর অরণি হরণ করেছিলাম। এই নিন অরণি। আর দেখুন আপনার চার ভাই বেঁচে উঠেছে। আপনি ইচ্ছা মতো বর প্রার্থনা করুন। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজকে প্রণাম করে বললেন চিরকাল যেন আমার ধর্মে মতি থাকে। যক্ষ বললেন তাই হবে। এর পরে আপনারা বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস করবেন। কোনও বিপদ হবে না। এই বলে ধর্মরাজ অন্তর্হিত হলেন। পঞ্চপাণ্ডব দ্বৈতবনের কুটিরে ফিরে এলেন।

হরিপদ ঘোষ

ভারতের পথে পথে

বিলাসপুর



ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুর জেলার সদর শহর বিলাসপুর। ধীবরকন্যা বিলাসার নামানুসারে এই শহরের নামকরণ হয়েছে। রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য বিলাসপুর মূলত রেলনগরী। ১৯১৯ সালে এই বিলাসপুর রেলস্টেশনে বসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ফাঁকি' কবিতাটি লেখেন। তার স্মারক রূপে ১নং প্লাটফর্মে স্মৃতিফলক রয়েছে। কাছেই পালিতে রয়েছে কারুতার্যময় শিবমন্দির। রয়েছে ভগ্নপ্রায় লাফাগড় দুর্গ। দুর্গের মন্দিরে রয়েছে বাঘের পিঠে অষ্টভুজা মেনকাদেবী। আছে দুটি কালীমন্দির, জগন্নাথ মন্দির, রামমন্দির, বালাজী মন্দির, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দির, অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ মন্দির। ২৮ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মণিয়ারি নদীতীরে তালগাঁওয়ে দেওরানি জেঠানি মন্দির ও রুদ্র শিবমন্দির।

জানো কি?

পুরো নাম

- WINDOW-- Wide Interactive Network Development for Office Work solution.
- GOOGLE--Global Organization of Oriented Group Language of Earth.
- YAHOO-- Yet Another Hierarchical Officious Oracle.
- HTML--Hyper Text Marcup Language.
- IP--Internet Protocol.
- CPU-- Central Processing Unit

ভালো কথা

দাঁড়কাকেরও বুদ্ধি আছে

আমার মা প্রতিদিন সকালে কোনো না কোনো ভিখারিকে দুটো রুটি দেয়। কোনো দিন যদি কেউ না আসে মা বলে আজকের দিনটি খারাপ গেল। সেদিনও সকালে কেউ আসেনি। মা বলল দুপুরে আসতে পারে। কিন্তু বিকেলেও যখন কেউ এল না তখন মা বলল আজকের দিনটা খারাপ গেল। তারপর আমাকে মা বলল শুকনো রুটি দুটো কলতলার ধারে রেখে দিতে। রুটি দুটো শুকিয়ে খরখরে হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে আবার একটা দাঁড়কাক এসে ঠোঁটে নিয়ে আবার রেখে দিল। একটু পরে রুটি দুটো নিয়ে কলতলায় যে জল জমে ছিল তাতে রেখে দিল। তারপর নরম হলে খেতে শুরু করল। আমি দেখে অবাক হলাম। বাবা কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, তোর কী একার বুদ্ধি আছে? কাকেরও বুদ্ধি আছে। পাখির মধ্যে দাঁড়কাক বুদ্ধিমান।

সোহম সরকার, সপ্তম শ্রেণী, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন ভ্য স মা তা	(১) লো সা ন ধ প বি
(২) ষ্ক শে র খ শ	(২) ণ ভো ষ্ম জ ব্রা ন

১৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) শৈলশিখর (২) সমবেদনা

১৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) বিশ্বাসঘাতক (২) পয়সাওয়ালা

উত্তরদাতার নাম

(১) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) সুমিতা মণ্ডল, মল্লারপুর, বীরভূম। (৪) অত্রি সরকার, বালুরঘাট, দ: দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৭।।





মুক্তির দিশারি ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য মধ্যমপুত্র ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে 'বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া' এই আপ্তবাক্যটি সর্বাংশে সার্থক ও সর্বজনগ্রাহ্য। অপরিসীম মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, স্বাদেশিকতা, প্রবল শিক্ষানুরাগ, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহামতি মানুষটি ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার তৎকালীন ৭৭, রসারোডের (বর্তমানে ৭৭, আশুতোষ মুখার্জি রোড) বাড়িতে বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়াদেবীর মধ্যম পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাত সন্তান। তিন কন্যা ও চার পুত্র। বাংলার বাঘ তাঁর ব্যাপ্তিতে যেখানে সীমিত করেছিলেন শিক্ষা, আইন ও স্বল্প পরিসরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে, সেখানে তাঁর এই স্বনামধন্য মধ্যম পুত্রটি নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন সমুদ্রের ন্যায়। শিক্ষার অঙ্গন থেকে আইন (কলকাতা উচ্চ আদালতের বার কাউন্সিলের সভাপতি রূপে), অপর দিকে রাজনীতি ও জনসেবা। খানিকটা আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত। কিন্তু আপামর বাঙ্গালি তথা সমগ্র ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে আজও এই মহান প্রাণের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে জোতিষ্কের ন্যায় বিচ্ছুরিত করে মাত্র ১১ বছরকাল অতি স্বল্প সময়ে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনকে আলোকিত করে উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন এক রাজনৈতিক নব দিশার। অধুনা হুগলী জেলার জিরাট নিবাসী এই মুখোপাধ্যায় কুলপতি তাই আজও বাঙালি হৃদয়ে মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অধুনা গুপ্তিপাড়া নিবাসী, কৃষ্ণনগরবাসী মধ্যবিত্ত সদ্ ব্রাহ্মণ শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্যের সুযোগ্যা কন্যা যোগমায়াদেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল ড. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই সময়ে খ্যাতির শিখরে থাকা অত্যন্ত সুযোগ্যপাত্র আশুতোষের বিবাহ উপলক্ষ্যে এক পয়সা দানসামগ্রী ড. গঙ্গাপ্রসাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে মানবতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। এদিকে বিবাহের দীর্ঘদিন পরও কোনো সন্তানসন্ততি না হওয়ায় যোগমায়াদেবীর প্রসঙ্গে ড. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী জগৎতারিণীদেবী ও অন্যান্য আত্মীয়রা নানান সমালোচনা শুরু করেন। এমনকী তিনি পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিতে আগ্রহ দেখান। ড. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ঘটনা উপলব্ধি করে এই বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতামত শুধুমাত্র ব্যক্ত করেননি, বরং মৃত্যুর আগে তাঁর বসতবাড়িটি একমাত্র পুত্র

ফঃ ৬

আশুতোষের নামে না দিয়ে আদরের পুত্রবধূ যোগমায়াদেবীর নামে উইল করে দেন। কালক্রমে যোগমায়াদেবীর প্রথম কন্যা, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের বড়ো ভগ্নী শ্রীমতী কমলাদেবীর জন্মের মধ্য দিয়ে এই আশঙ্কার স্থায়ী অবসান ঘটে। ১৮৮৯ সালে যখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র ২৪ বছর ৬ মাস, তখন মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ড. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অতর্কিতে সামান্য রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন।

অতঃপর একে একে আশুতোষের বাকি সন্তানদের জন্ম হয়। ছোটোবেলা থেকেই শ্যামাপ্রসাদ (তখন ডাকনাম ছিল বেণী, যোগমায়াদেবী আদর করে ডাকতেন ভোতন বলে) ছিলেন খানিকটা ডাকাবুকো, নিজ অধিকার সম্বন্ধে প্রখরভাবে সচেতন, প্রতিবাদী এবং অন্যান্য সমবয়সিদের তুলনায় আলাদা। ভারিক্কি চালচলন,। প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী, মানসিক বিকাশেও বহুযোজন অগ্রগণ্য। এই সন্তানের মধ্যে তাঁর নিজ সত্তার পূর্ণবিকাশের বীজ নিহিত রয়েছে, এই সত্য উপলব্ধি করতে দূরদর্শী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কোনো অসুবিধা হয়নি। তাই তিনি শ্যামাপ্রসাদকে তৈরি করেছিলেন নিজের মতো করে, তাঁর প্রকৃত উত্তরসূরি হিসাবে, যা শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক দশক উপাচার্য থাকাকালীন একজন কিংবদন্তী প্রশাসক হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ সর্বজন বিদিত। আর উপাচার্য থাকাকালীন খানিকটা বোধহয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। এই ঘটনাও শ্যামাপ্রসাদকে একজন কালজয়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসক হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিল। স্যার আশুতোষ শিক্ষাবিস্তারে ভবানীপুরে মিত্র ইনস্টিটিউশনের শাখা চালু করলেন। শ্যামাপ্রসাদকে তিনি এই স্কুলেই ভর্তি করে দেন। প্রখর মেধাবী, উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী, বন্ধুবাৎসল্য ও শিক্ষকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ শ্যামাপ্রসাদকে গড়ে তুলেছিল একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে। মেধার কারণে বয়স অপেক্ষা কম সময়ে অসামান্য সাফল্যের নিদর্শ হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে প্রেসিডেন্সি (তৎকালীন হিন্দু কলেজ) কলেজে ভর্তি হলেন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। স্নাতক পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সমকালীন সময়ে স্যার আশুতোষের নির্দেশে সদ্য চালু হওয়া বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হলেন ও পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। এরপর আইন নিয়ে পড়া। জীবনে কোনোদিন দ্বিতীয় না হওয়া এই অসামান্য মোধাবী ছাত্রটির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে প্রবেশ মাত্র ২৩ বছর বয়সে। ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে পদ খালি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ক্ষেত্রের এই কনিষ্ঠতম সদস্যটি তাঁর অবিসংবাদী কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন অসামান্য দূরদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধির জন্য। এরপর বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কলকাতা উচ্চ আদালতের বার কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া। প্রতিক্ষেত্রেই যেন এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন! এরপর ১৯৩৪ সালে প্রথমবার ও ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে মনোনীত হলেন। বিশ্বের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসেবে রচিত হলো শিক্ষা পরিচালনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত, যা আজও অকল্পনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সুনিপুণভাবে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমাকে বর্ধিত করেছেন বহুগুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমোহর, কেন্দ্রীয় পাঠাগার নির্মাণ, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ চালু করা, বাংলায় গবেষণাপত্র লেখার অনুমতি প্রদান, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা, অভিধান রচনা, সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার ক্যাম্পাসে শারীরবিজ্ঞানে স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করা, রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ অধ্যাপক রূপে (শত সমালোচনা উপেক্ষা করে) নিয়োগ, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ মাতৃভাষায় দেওয়ানোর মতো কালজয়ী সিদ্ধান্তগুলো তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতম উপাচার্য হিসেবে অক্ষয় ও অমর করে রেখেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে এমএ পড়াকালীন বিশিষ্ট কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী শ্রীমতী সুধাদেবীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ১৬ এপ্রিল ১৯২২ সালে। একটি গোটা ট্রাম নিয়ে বরযাত্রী গিয়েছিল ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রথম ট্রামে চড়া।

শ্যামাপ্রসাদের সহোদর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনিকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী সম্ভবত দৈহিক স্থূলতার জন্যই ড. মুখোপাধ্যায় খেলাধুলা থেকে খানিকটা নিস্পৃহ ছিলেন। ছোটাছুটিতে কাহিল হয়ে পড়তেন। কিন্তু মানসিক বিকাশের দ্রুততার কারণে সম্ভবত তাঁর মেলামেশার ক্ষেত্রটি ছিল বয়সে বড়োদের সঙ্গে। মজা করার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হলেও স্বভাবোচিত রাশভারী ছিলেন। কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁর অনমনীয় মানসিকতার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রজীবনে। তিনি তখন হিন্দু কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র। স্থূলদেহ নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। তাকে দেখে কিছু অপরিচিত ছাত্র নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন করছে। প্রখর বুদ্ধির অধিকারী শ্যামাপ্রসাদের সন্দেহ হলো। হঠাৎ ওই ছেলেদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে অতিপরিচিতের ভাব করে তাঁর স্থূল উদরের উপর হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করল 'আরে ভাই কী খবর?' উনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশাল মুঠো তুলে তার পিঠে দুম করে কিল মেরে খাবল দিয়ে টিপে ধরে বললেন 'এই তো! কদ্দিন পরে দেখা।' পিঠের আঘাতে কাতর হয়ে সেই ছাত্রটি তখন আঁতকে উঠে কাঁচুমাচু মুখে বলে উঠল 'ওঃ আর একজন ভেবে ভুল করেছি, তাই চিনতে

পারিনি, ছাড়ুন ছাড়ুন।' শ্যামাপ্রসাদ তখন পিঠের খাবল ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন 'সত্যি! তাইতো? আমারও ভুল হয়েছে দেখছি! মনে করবেন না কিছু।' এই বলে তাকে ছেড়ে দিলেন। এক নির্মল রসিকতার মোড়কে প্রতিপক্ষকে তিনি সেদিন 'টিট ফর ট্যাট'-এর যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা থেকেই তাঁর চরিত্রের আপোশহীনতার এক অনন্য নজির দেখতে পাওয়া যায়। আর সম্ভবত এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র দেশ ছাপিয়ে সংসদ ভবনকে উত্তাল করে তুলেছিল। আর ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের এই আপোশহীন সংগ্রামের মূল্য তাঁকে চোকাতে হয়েছিল আত্মবলিদানের মাধ্যমে। স্পষ্টবক্তা, নির্ভীক এই রাষ্ট্রযোদ্ধার শিক্ষা ছিল : 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করো, প্রতিবাদ করো, প্রয়োজনে নাও প্রতিশোধ।' অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নেওয়াকে ঘৃণা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক উপাচার্য ছিলেন তিনি। মনোনীত হয়েছিলেন ১৯৩৩ সালে। ঠিক তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালে ঘটল তাঁর পত্নী বিয়োগ। কিন্তু পুনরায় বিবাহ না করে চার সন্তানকে স্বয়ং পিতা-মাতার স্নেহে লালন পালন করেছিলেন।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর পদচারণা স্বল্পকালীন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ার তথা সর্বজন সমাদৃত ডাক্তারজীর সান্নিধ্যে আসা ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি কলকাতায়। প্রত্যক্ষভাবে কখনও স্বয়ংসেবক না হলেও দেশভাগের পূর্বেই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি পোষণ করতেন সুগভীর শ্রদ্ধা। ১৯৪০ সালে লাহোরে সঙ্ঘের এক অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে ভারতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আর এস এস হলো একমাত্র রুপালি রেখা।

রাষ্ট্রের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের উদগ্র বাসনা সঙ্ঘকে জাতীয় উন্নয়ন ও জাতীয় মেরুদণ্ড গঠনে এক সোপানে পরিণত করে তুলেছিল। দেশভাগের সময় শাসকগোষ্ঠীর তথা তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে একত্রে রাষ্ট্রনির্মাণে ব্রতী হলেও গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে স্বয়ংসেবকদের উপর নেমে আসে এক নির্মম অত্যাচার। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো সঙ্ঘকে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের রাজনৈতিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সঙ্ঘ কখনই হস্তক্ষেপ করেনি। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বরাবরই ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত। কিন্তু এই ঘটনা কয়েকজন কার্যকর্তার মনে নতুন করে চিন্তার উদ্রেক ঘটালো। তাঁরা চিন্তা করলেন সংসদীয় গণতন্ত্রে যদি লোকসভায় নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করেন তবে এর কোনো আশু সমাধানসূত্র বেরোবে না। এই অন্যায় ও অত্যাচারের পরিমাণ উত্তোরোত্তর বাড়বে। হিন্দু নিধনের কোনোদিন কোনো সুরাহা হবে না। এই ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো এমন ব্যক্তি কোথায় যিনি ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে লোকসভার অভ্যন্তরে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন আবার সঙ্ঘকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখবেন? এমন সময়ে এগিয়ে এলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

তখনকার পরিস্থিতিতে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, দেশভাগে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, কপর্দকশূন্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে উন্নাসিকতা ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় গর্জে উঠলেন বঙ্গজনক, শিক্ষামহারথী, ভারত সরকারের প্রথম সার্থক ভারী শিল্পমন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলা, অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে ইতিপূর্বেই তিনি ঐতিহাসিক ক্রিপট্স কমিশনের মাধ্যমে মহম্মদ আলি জিন্নার করাল পাকিস্তানি গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। তিনি পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সভা থেকে। নিজেকে নিয়োজিত করলেন জনসেবায়, প্রত্যক্ষভাবে হয়ে উঠলেন উদ্বাস্তু মানুষের পরিত্রাতা হিসেবে।

শ্যামাপ্রসাদের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ থেকে বিচ্যুত কংগ্রেস কার্যত হয়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িকতার তোষক, দেশের দুর্ভাগ্যবাহী একটি মঞ্চে। প্রাতিষ্ঠানিক খ্যাতি ও সম্মানের প্রতি ভাবলেশহীন শ্যামাপ্রসাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র জনসেবা। তথাকথিত সমাজতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী দল যারা বিদেশিনীতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, এরা বেশিরভাগই স্বঘোষিত সাম্যবাদী, রাশিয়ার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, বাস্তবে মুসলমান তোষক ভিন্ন কিছুই নয়। শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করলেন এমন এক মাৎস্যন্যায় অবস্থায় প্রয়োজন এক নতুন দল গঠনের যা ভারতীয় ভাবধারাকে অগ্রসর করবে। রাষ্ট্রীয় হিত হবে এই দলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্যক্তির চেয়ে দল হবে বড়ো, আবার রাষ্ট্রের হিতে দল তার সমস্ত সত্তাকে তৎক্ষণাৎ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে। সুতরাং এই দুই ভাবধারার মেলবন্ধন আবশ্যিক হয়ে উঠল। ভারতকেশরী শরণাপন্ন হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর)-র। শ্রীগুরুজী তাঁকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যার মূল আদর্শ হলো ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণবিকাশ সাধন। কিন্তু স্বয়ংসেবকরা কোনো দলের দাসত্ব করবেন না। এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মঞ্চ, তাই কোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে এটিকে যেন কোনো প্রকারে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ সহমত পোষণ করলেন এবং শ্রীগুরুজীকে আশ্বস্ত করলেন যে নতুন দল গঠিত হবে এবং আর এস এস-এর স্বয়ংসেবকরা রাষ্ট্রনির্মাণে ও এই দলের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দল সঙ্ঘের ভূমিকা বা কর্মসূচিকে প্রভাবিত করবে না প্রত্যক্ষভাবে। শ্রীগুরুজী অনুমতি দিলেন। এরপর শুরু হলো ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নবউন্মেষে পথচলা। অকৃত্রিম রাষ্ট্রভাবনা, বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি, সর্বধর্ম সমভাব ও ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুন্মেষের মাধ্যমে রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য নতুনযুগের সূচনা হলো। 'ব্যক্তির ঊর্ধ্বে দল এবং দলের ঊর্ধ্বে দেশ'—এই মহান ভাবনাকে সম্বল করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অগ্রসর হলেন।

রাষ্ট্রের সম্মানকে রক্ষা করতে হবে যে কোনো মূল্যেই। গঠিত হলো ভারতীয় জনসঙ্ঘ।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাপর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল সভাপতি নির্বাচন। যদিও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। ১৯৫১ সালের ১১ অক্টোবর দলের একটি প্রতিনিধি দল সকাল ৮টা নাগাদ দিল্লির ১০ নম্বর পুসারোডে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন লালা হংসরাজ গুপ্তা, পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা, প্রফেসর মহাবীর এবং শ্যামলেশ দাশ।

ড. মুখোপাধ্যায় বারান্দায় হাস্যমুখে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে তাঁর ছোটোপড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে রোজকার অভ্যাস মতো ভোর সাড়ে ৬টায় প্রাতঃভ্রমণ সেরে তিনি অধ্যয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মোটা কাপড়ের ধুতি-পঞ্জাবি, তুসের চাদর ও সাধারণ চটি পরে তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হন। চেয়ার অপর্যাপ্ত থাকায় নিজেই পাশের ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে আসেন ও সকলের বসার পর নিজে বসেন। তারপর লালা হংসরাজ প্রথম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করলেন দলের সভাপতি হিসেবে। তিনি আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসে কিছুক্ষণ গম্ভীরমুখে বসে রইলেন। নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। অবশেষে তিনি ভারতমাতার সেবায় এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি জানালেন। লাগাতার কুৎসা, অপপ্রচার, নিন্দা ও টিপ্পনীকে উপেক্ষা করে নির্ভীক চিত্তে তাঁর এগিয়ে চলা শুরু হলো। তাঁর দিল্লিতে রামলীলা ময়দানের জনসভা যে বিপুল জনসমুদ্রের আকার নিয়েছিল, তা দেখে ভীত তৎকালীন শাসক তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' শ্যামাপ্রসাদ আখ্যা দিয়েছিল। ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী তথা অবিসংবাদী জননেতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িক নেতা! উদ্বাস্তু মানুষের রক্ষাকর্তা, পশ্চিমবঙ্গের জনক শিকার হলেন গভীর রাজনৈতিক ঘৃণ্য চক্রান্তের। কিন্তু প্রবহমান গঙ্গার মতো বৃহৎ ও পবিত্র শ্যামাপ্রসাদ সিংহবিক্রমে উপেক্ষা করলেন এই চক্রান্তকারীদের।

১৯৫২ সাল। প্রথম লোকসভা নির্বাচন। জনসঙ্ঘের ৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন সারাদেশের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে : কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব (ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়), মেদিনীপুর-ঝাড় গ্রাম (দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং রাজস্থানের চিতোর (উত্তমশঙ্কর মুলটিভাই ত্রিবেদী)। মাত্র তিনজন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও অপরিসীম প্রজ্ঞা, অসাধারণ বাগ্মিতা, প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা তাঁকে অকংগ্রেসি দলগুলির সমর্থনে বিরোধী দলনেতার পদে আসীন করেছিল। শ্রীগুরুজী কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের থেকে নিষ্ঠাবান, সৎ, পরিশ্রমী ও দেশমাতৃকার সেবায় সংকল্পিত স্বয়ংসেবকরা শ্যামাপ্রসাদের ভাবনাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে মহৎকাজটি নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তারই মূর্ত প্রতিফলন আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি নামক মহীরূপ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে পিছনে ফেলে আজ ১১ কোটির বেশি সদস্য নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। আজ একজন বাঙ্গালি হিসেবে ভাবতে গর্ববোধ হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়, এই বাঙ্গলার গর্ব, আপামর বাঙ্গালির রক্ষাকর্তা, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ আজ রাজনৈতিক ভাবে শুধুমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের পরিধি অতিক্রম করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ আজ শ্যামাপ্রসাদের অনুগামী।

এই জাতীয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ সেদিন জম্মু প্রজাপরিষদের ডাকে কাশ্মীরে সমস্যা সমাধানে নেহরুকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উদাসীন ছিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি কাশ্মীর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীগুরুজীর মনে আশঙ্কা ছিল কোনো বিপদ ঘটতে পারে। তাই তিনি ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বহু চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে আটকাতে। কিন্তু বিধি বাম। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জম্মু হাসপাতালের নারী ও প্রসূতি বিভাগে এক রহস্যজনক পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ভোররাতে মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মতো মহৎ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয় না। শ্যামাপ্রসাদ কোনো ব্যক্তিত্ব নয়, এক সুবিশাল প্রতিষ্ঠান, মৃত্যু যার কাছে অতি তুচ্ছ ঘটনা। তাঁর চলার পথের পাথেয় আজও ভারতীয় জনতা পার্টি বহন করে চলেছে। প্রদীপের শিখার আলোয় পদ্মফুল বিকশিত হয়েছে সারাদেশ জুড়ে। তাই আমাদের চলতে হবে তাঁর দেখানো পথে। তিনি বিশ্বাস করতেন অন্য দেশকে অনুকরণ করে নয়; একতা, সংগঠিত জাতিগঠন, সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে, রক্ষণশীলতা ও আধুনিক চিন্তার মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতিই হলো জাতির মেরুদণ্ড। তাই রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। রাষ্ট্রের বিকাশে হিন্দুত্বের জাগরণ ছাড়া কোনো বিকল্প চিন্তা বাতুলতা মাত্র। কারণ হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব। হিন্দুরাষ্ট্র বলতে বোঝায় ভারতীয় সংস্কৃতি যা পরধর্ম সহিষ্ণুতার নামান্তরমাত্র। নির্দিষ্ট ধর্মের ভোট আদায়ের নামে বাকি রাজনৈতিক দলগুলি তোষণের যে নির্লজ্জতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ধিক্কার যোগ্য। হিন্দুত্বের যদি জাগরণ না হয়, অচিরেই এই মাতৃভূমির কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। পরিশেষে, শ্যামাপ্রসাদের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে :

''কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা''

(২৩ জুন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সিয়েচেন হিমবাহ সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সিয়েচেন হিমবাহের গৌরবময় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সম্প্রতি বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র সফর করেন। এটি ছিল শ্রীসিংহের প্রথম সিয়াচেন সফর। তুষারাবৃত এই অঞ্চলের থৈইসে বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে স্বাগত জানান বাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে: জেনারেল রণবীর সিংহ। শুভেচ্ছা বিনিময় এবং এই অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করার পর শ্রীসিংহ আকাশপথে সিয়াচেন হিমবাহ ঘুরে দেখেন এবং বরফে ঢাকা এক চৌকিতে অবতরণ কনে। এরপর প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বের সর্বোচ্চ এই যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন সেনা- জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে সেনা-জওয়ানদের উদ্দেশে শ্রী সিংহ বলেন, 'সিয়াচেনে মোতায়েন প্রত্যেক সেনাকর্মীর জন্য আমি গর্বিত, যারা আমাদের মাতৃভূমির রক্ষায় আপোশহীন ভাবে কাজ করে চলেছেন। সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের



দেশের সেবায় পাঠিয়েছেন, আমি তাদের জন্যও গর্বিত। আমি এই অভিভাবকদের সকলকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেব।'

সিয়াচেনে মোতায়েন বীর সেনা-জওয়ানদের সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সীমান্ত এলাকার সুরক্ষা এবং দেশবাসীর নিরাপত্তায় যে ভূমিকা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার প্রশংসা ও অদম্য সংকল্পের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। বিশ্বের অন্যতম প্রতিকূল পরিবেশে দেশের স্বার্থে কর্তব্য পালনে সেনা-জওয়ানদের নিষ্ঠার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সিয়াচেন হিমবাহে সেনাবাহিনীর দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ অবগত রয়েছে বলে জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেনা জওয়ানদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁদের যাবতীয় চাহিদা পূরণে সরকারের সমস্তরকম সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। বীর গতিপ্রাপ্ত সেনানীদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিয়াচেন যুদ্ধ স্মারককে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করেন।

প্রথম বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের উদ্বোধন করলেন ডাঃ হর্ষবর্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই) আয়োজিত প্রথম বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের উদ্বোধন করে বলেন যে, 'কম খাওয়া' কিন্তু 'সঠিক খাওয়া'কে এক জনআন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এছাড়া, 'জন ভাগিদারি'র মধ্য দিয়ে ভারতকে পোলিও মুক্ত করে গড়ে তুলবে হবে। তিনি বলেন, আমাদের এক দানা খাদ্যও নষ্ট করা চলবে না, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আমাদের প্রত্যেককে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ভাবে অবদান রাখতে হবে। একই সঙ্গে এই উদ্যোগ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টিও নির্মূল করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের স্বপ্নের মধ্যে স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও এফএসএসএআই-এর 'সঠিক খাদ্য'-এর আন্দোলনের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। তিনি এফএসএসএআই কমপ্লেক্সের মধ্যে সাইকেল চালনারত গান্ধীজীর এক মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর সার্ধশততম জন্মজয়ন্তী পালনের এই মুহূর্তে তাঁর এই মূর্তিটি সুস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর গুরুত্বের প্রতীক। তিনি বলেন, গান্ধীজীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক কর্তৃপক্ষ'কে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ দেশের সাতটি রাজ্যও কেন্দ্রশাসিত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ দেশের সাতটি রাজ্যও কেন্দ্রশাসিত কতৃপক্ষকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এফএসএসএআই কর্তৃক প্রথম রাজ্য খাদ্য নিরাপত্তা সূচক বিষয়টির কথা জানানো হয়। ডাঃ হর্ষবর্ধন এদিন ভোজ্যতেলে ভেজাল পরীক্ষার জন্য ব্যাটারি-চালিত ও সহজে বহনযোগ্য একটি যন্ত্রের উদ্বোধন করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'খাদ্য নিরাপত্তা ম্যাজিক বক্স' নামে একটি টুল কিট-এরও তিনি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এফএসএআই-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক পবন আগরওয়াল, চেয়ারপার্সন শ্রীমতী ঋতা তেওয়াতিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে মোদীর গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিপুল জনাদেশ সম্বল করে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবার পর সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। প্রথমে মালদ্বীপ তারপর শ্রীলঙ্কায়। কলম্বোয় পা রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর এই সফরটি ভারত-শ্রীলঙ্কার বর্ষপ্রাচীন অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের সুরে বেঁধে নেন। তিনি ইস্টার সানডে জঙ্গিহামলায় ক্ষতবিক্ষত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। কোচ্চিকাড়েতে সেন্ট অ্যান্টনির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ভারতের 'নেবার ফার্স্ট' নীতির কথা উত্থাপন করে ভারত-শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম সফর। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি শ্রীলঙ্কায় পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এক টুইটবার্তায় তিনি জানান, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীলঙ্কা আবার উঠে দাঁড়াবে। জঙ্গিদের কাপুরুষোচিত হামলা কখনওই শ্রীলঙ্কার মানুষের মনোবল ভাঙতে পারবে না। এই লড়াইয়ে ভারত সবসময়েই শ্রীলঙ্কার পাশে থাকবে।' মালদ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে তিনি টুইট করেন, 'গত চার বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার শ্রীলঙ্কায় আসতে পেরে ভালো লাগছে। শ্রীলঙ্কার মানুষ যেভাবে আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। একটা কথা জানাতে চাই, ভারত তার বিপদে পড়া বন্ধুদের কোনওদিনই ভোলে না।' প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপালা সিরিসেনা এবং বিরোধী দলনেতা মাহিন্দা রাজাপক্ষের সঙ্গে দুটি ভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন।



দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর এটি ছিল নরেন্দ্র মোদীর প্রথম শ্রীলঙ্কা সফর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জঙ্গিহামলার ঘটনার তদন্তে ভারত শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করছে। ইন্ডিয়া হাউসে আয়োজিত একটি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি এখন অনেকটাই উজ্জ্বল। এর জন্য দায়ী বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়েরা।' তিনি আরও বলেন, 'গণতন্ত্র ভারতীয় জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গত পাঁচ বছরে আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি। কিন্তু এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি। কথা দিচ্ছি, সব পাথর উলটে দেখা হবে।' শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সমাধিস্থ বুদ্ধমূর্তি উপহার দেন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সারা বিশ্বের একজোট হওয়া প্রয়োজন : নরেন্দ্র মোদী

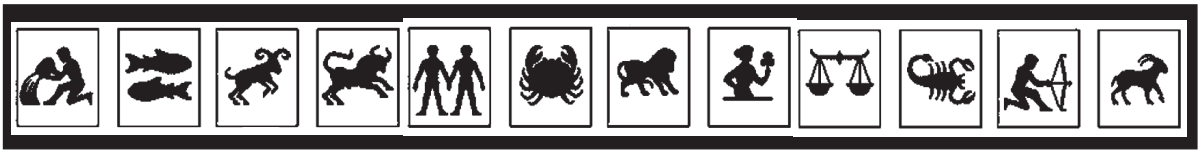
নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মালদ্বীপ সফরে সারা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মালদ্বীপের সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিভিন্ন ইসলামিক দেশের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের সামনে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। যার মোকাবিলায় বিশ্বের প্রতিটি দেশের একজোট হওয়া প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের আহ্বানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জানান, মালদ্বীপের বিখ্যাত ফ্রাইডে মসজিদের সংরক্ষণে ভারত তার ভূমিকা পালন করবে।

সংসদের ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলামিক সন্ত্রাস কোনও একটি দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। সারা বিশ্বেই সন্ত্রাসবাদ এখন একটি চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে ইসলামিক দেশের মদতপুষ্ট সন্ত্রাস এখন মানবসভ্যতাকেই সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনে দরকার সারা বিশ্বের সম্মিলিত প্রয়াস। সুতরাং ভারত ও মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করে তোলা খুবই প্রয়োজন। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী ভারতের 'নেবার ফার্স্ট' নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সন্ত্রাসবাদে প্রত্যক্ষ মদত দেবার জন্য পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'জল এখন মাথার ওপর দিয়ে বইছে। সবাই মিলে এর প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।' তিনি বলেন, বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত এবং মালদ্বীপ পরস্পরের বন্ধু। মালদ্বীপের মানুষ যেভাবে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করছেন প্রতিটি ভারতীয় সমর্থন করে।'

মালদ্বীপের সেনাবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভারতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারেও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি সলিদ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী ঐকমত্য পোষণ করেন। মালদ্বীপের ঐতিহাসিক ফ্রাইডে মসজিদের সংরক্ষণে ভারত সাহায্য করবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



১৭ জুন (সোমবার) থেকে ২৩ জুন (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে শুক্র, মিথুনে রবি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। ২১ জুন, শুক্রবার ভোর ২-৩২ মিনিটে বুধের কর্কটে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে কুম্ভে শতভিষা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততা। অপ্রত্যাশিত কোনো খবরে বিশেষ আনন্দ। ছোটো ব্যবসায়ীদের ঋণ নিতে পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতা। স্ত্রীর পরামর্শে বৈষয়িক উন্নতি। নিজ পছন্দের প্রার্থীর সঙ্গে বিবাহ। বিদ্যার্থীদের বহু পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দ্বারা সাফল্য। ক্রনিক রোগীদের অসুস্থতা বৃদ্ধি ও ক্লেশ।

বৃষ ঃ ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় কাঙ্ক্ষিত ফল। উদ্যোগী মনোভাব ও কারিগরি কুশলতায় একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য ও শংসা প্রাপ্তি। রমণীর সান্নিধ্য ও আলটপকা মন্তব্যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। চলাফেরায় সাবধানতা আবশ্যক। গৃহ, জমি থেকে প্রাপ্তি।

মিথুন ঃ শরীরের যত্ন, দোদুল্যমানতা পরিহার ও বাক্‌সংযমে নতুন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পাথেয়। শৌখিন, বিলাসী, তীর্থ দর্শন, দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনের আশীর্বাদ, বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য, সমাজকল্যাণে ব্যাপৃত মন। ভ্রাতা-ভগ্নী ও কর্মপ্রার্থীর সফল মনস্কাম।

কর্কট ঃ অসুস্থতা, স্থানান্তর, বিবাদ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানিয়ে চলতে হবে। প্রবাসী বন্ধুর সহায়তায় নিসর্গ পরিদর্শন। পরিজন পরিবৃত হয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান। সপ্তাহের শেষভাগে পরাক্রম, আধিপত্য, ভ্রাতৃসুখ, পুত্র কল্যাণে বৈভব, পরিবারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি।

সিংহ ঃ কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব। বিদ্যা, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। কবি, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, গবেষকের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও মান্যতা প্রাপ্তি। গৃহিণীর পেশা, ব্যবসা, ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় বিজয়ীর সম্মান। শত্রুতার প্রশমন, ঋণমুক্তি, গৃহ ও বাহন যোগ।

কন্যা ঃ কৃষি, জলাশয় খনন, হোটেল, রেস্তোরা, ফ্যাশন ডিজাইনার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়। চর্মজাত ব্যবসায় ধনলক্ষ্মীর কৃপা বর্ষণ। বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। দৃঢ়তা, দক্ষতার সমহারে জীবিকায় বিকল্প পথের সন্ধান। শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হবে। পরিণয়ে প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি।

তুলা ঃ বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে মনসংযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, অবসাদ, নতুন কর্মপরিকল্পনা, ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। সপ্তাহের শেষভাগে নীচ জাতীয় সংসর্গ, যুবাদের রহস্যজনক কাজে আসক্তি। চলাফেরায় ও মানসম্মান বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

বৃশ্চিক ঃ নিকটজনের সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি, পারিপার্শ্বিক সমস্যা, শারীরিক অসুস্থতায় মানসিক চাপ ও ক্লেশ। গৃহ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের ইতিবাচক ফল। ব্যবসার সম্প্রসারণ, ভ্রমণ ও কুহকিনীর চক্রান্ত অথবা ছিদ্রান্বেষীদের থেকে সতর্ক থাকা দরকার। কীট-পতঙ্গ এবং শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও রক্তক্ষরণ যোগ।

ধনু ঃ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌পটুতায় স্বজন সম্পর্কে উন্নতি। ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রতিবেশীর সহযোগিতায় সামাজিক সেবামূলক কর্মে আপ্লুত মন ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় সিদ্ধি করায়ত্ত। লিভার, পিত্তপীড়া, আমাশয় ও বাহনজনিত ক্লান্তি, ক্লেশ।

মকর ঃ সুস্থ শরীর, সুস্থ মন। ভূখণ্ড ও এলাকায় অধিপত্য ও সম্মান। পরিবহন, ওষুধ, বস্ত্র, অলংকার ও শৌখিন ব্যবসায় প্রসার ও প্রাপ্তির ভাণ্ডার আশাপ্রদ। আধুনিক মনস্কতার বিদ্যার্থীর চঞ্চল মানসিকতা। আর্থিক লেনদেন ও লিখিত চুক্তি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

কুম্ভ ঃ শিষ্টাচার, সৌজন্য, দৃঢ়তা, মানবিকতা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে অর্থ, বিত্ত, সম্মান, খ্যাতি অর্থাৎ সুন্দর ও বর্ণময় জীবন— যার প্রভাব সমাজে পরিব্যাপ্ত হবে। পারিবারিক সুস্থিতিতে শান্তির বেলাভূমি প্লাবিত হবে। স্ত্রীর উদারতা ও অহমিকাহীন বুদ্ধিমত্তায় বিকশিত অন্তর। গুরুজনের আশীর্বাদ প্রাপ্তি।

মীন ঃ কর্মক্ষেত্রে পড়ে থাকা কাজ ও পারিপার্শ্বিক সমস্যা, নিকটজনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে শান্ত-সংযত থেকে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করুন। গৃহ সমস্যা ও বিদ্যার্থীর পড়াশোনায় মনসংযোগ দরকার। বিনিয়োগ, ভ্রমণ ও ক্রয়-বিক্রয় বর্জনীয়। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যক্তিত্বের কাছে অভিসন্ধির পরাজয়।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৪০তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ৩০শে জুন, ২০১৯

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে